আইনে রাসূল

আদর্শ নারী

المرأة المثالية

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

আদর্শ নারী
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রকাশক ঃ

আব্দুর রায্যাক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা
থানা-শাহ মখদুম, রাজশাহী।

প্রথম প্রকাশ
ছফর ১৪২৮ হিজরী
ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ঈসায়ী
ফাল্গুন ১৪১৩ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
তূবা কম্পিউটার
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা
থানা-শাহ মখদুম, রাজশাহী।
মোবাইল ঃ ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭।

মূল্য ঃ ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

ADARSA NARI :
WRITTEN & PUBLISHED BY ABDUR RAZZAQ BIN YOUSUF MUHADDIS, AL-MARKAZUL ISLAMI AS-SALAFI, NAWDAPARA, RAJSHAHI. Mobile: 01717088967.
Price: 50.00 Taka only.

সূচীপত্র

ভূমিকা

إِنَّ اَلْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আদর্শ পরিবার বইটি প্রকাশের পর পরই আদর্শ নারী বইটি বের করার ইচ্ছা করেছিলাম। কারণ বর্তমান বিশ্বে মুসলিম সমাজে নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন যেমন হচ্ছে না, তেমনি ইসলামী আদর্শে নারী জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বহু বই-পুস্তক বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পরিবর্তে জাল-যঈফ হাদীছ এবং বানাওয়াট মিথ্যা ক্বিছছা-কাহিনীতে ভরপুর। যা পড়ে নারীরা প্রকৃত ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে না। পারে না রাসূলে কারীম (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী নিজ জীবন ও পরিবার গঠন করতে। তাই বর্তমান নারী সমাজকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গড়ার লক্ষ্যে একটি বইয়ের একান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ একটা পরিবারকে সুন্দর করে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার জন্য একজন আদর্শ নারীই হচ্ছে মূলভিত্তি। স্তম্ভ ছাড়া যেমন একটি ঘর শূন্যে দাড়িয়ে থাকতে পারে না, তেমনি আদর্শ নারী ছাড়া আদর্শ পরিবারের আশা করা যায় না। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) স্বামী-স্ত্রীকে সমানভাবে আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার অধিকার দিয়েছেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, স্বামী হচ্ছে কর্তা আর স্ত্রী হচ্ছে কর্তৃ *(সিলসিলা ছহীহা)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, স্বামী যেমন পিরবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে স্ত্রীও তেমনি জিজ্ঞাসিত হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)*। আর এজন্যই নবী করীম (ছাঃ) আদর্শ নারীকে বিবাহ কতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম)*। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মহিলা কিভাবে আদর্শ নারী হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য 'আদর্শ নারী' নামে বইটি প্রকাশ করলাম। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বইটি প্রকাশে অনেক বিলম্ব হ'ল, সেজন্য আমরা দুঃখিত। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০০৭ উপলক্ষ্যে বইটি প্রকাশিত হ'ল- ফালিল্লাহিল হামদ।

বইটি প্রকাশে আমাকে একান্তভাবে সহযোগিতা করেছে আমার সহধর্মিনী উম্মু মরিয়ম। সে আমার অন্যান্য বইগুলিতেও যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছে। আমি তার জন্য প্রাণ খোলা দো'আ করছি, আল্লাহ যেন তাকে এর উত্তম পারিতোশিক দান করেন এবং আমার লেখনীর কাজে আরো সহযোগিতা করার তাওফীক্ব দান করেন-আমীন! বইটি প্রকাশে আমাকে আরো সহযোগিতা করেছেন মাসিক **আত-তাহরীক**-এর সহকারী সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। আল্লাহ তাকেও জাযায়ে খায়ের দান করুন। এছাড়া আরো অনেকে বিভিন্নভাবে বইটি প্রকাশে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার জন্য দো'আ করছি, আল্লাহ যেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন-আমীন!

অনেক সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও বইটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সে বিষয়ে সম্মানিত পাঠকগণ অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সাদরে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ। বইটি পাঠ করে মুসলিম নারীগণ যদি নিজেদেরকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন এবং এর মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও দেশে ইসলামী ভাবধারা ফুটে ওঠে তাহ'লে আমরা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা স্বার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ আমাদের এ শ্রমটুকু কবুল করুন-আমীন!

॥লেখক॥

আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেকটি জিনিসের ভাল ও মন্দ গুণাগুণ রয়েছে। এই গুণাগুণগুলিকে সে জিনিসের বৈশিষ্ট্য বলা হয়। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু উত্তম আদর্শ রয়েছে। সেগুলিই হচ্ছে আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলি যে নারীর মধ্যে থাকবে সে-ই ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ নারী বলে বিবেচিত হবে। অতএব বিশ্বের মুসলিম নারীদের শিক্ষার লক্ষ্যে আদর্শ নারীর কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোকপাত করা হ'ল।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সম্পূর্ণ দুনিয়া হচ্ছে সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে সতী-সাধবী নারী' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২৯৪৯)*। অত্র হাদীছে একমাত্র আদর্শনারীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়েছে। নবী (ছাঃ) এ কথা বলে নারীদের মান-সম্মান বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন এবং জাতির কাছে তাদেরকে মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য করে পেশ করেছেন। পৃথিবীর কোন জাতি নারীদেরকে কোন দিন এরূপ সম্মান দিতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা আদর্শ নারীর গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهَ

'অতএব যারা সতী-সাধবী স্ত্রী লোক তারা তাদের স্বামীদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম পালনকারীণী এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে গোপনীয় বিষয়গুলির হেফাযতকারীণী হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ নিজেই তার হেফাযত করেন' *(নিসা ৩৪)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আদর্শ নারীর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন-

(১) সতী-সাধবীঃ ঐ স্ত্রী লোককে সতী-সাধবী বলা হয় যার মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে অসাধু ও দৃষ্টিকটু কোন আচরণ পরিলক্ষিত হয় না।

(২) আল্লাহর হুকুম পালনকারীণী অর্থাৎ আল্লাহর আইন-বিধান স্বতঃস্ফূর্ত ও সার্বিকভাবে মেনে চলা। (৩) স্বামীর অনুপস্থিতিতে গোপনীয়তা রক্ষা করা। এগুলি হচ্ছে আদর্শ নারীর বিশেষ গুণাবলী, যা অর্জনের জন্য প্রত্যেক মুসলিম রমনীর সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে যত বাধা আসুক না কেন তা উপেক্ষা

করার চেষ্টা করতে হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে। কেননা তিনি নিজেই তাদের হেফাযতের অঙ্গীকার করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, ‘নবী যদি আপনাদের সবাইকে তালাক দেন তাহ’লে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ নবীকে তোমাদের পরিবর্তে এমনসব স্ত্রী দিবেন যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে। যারা হবে সত্যিকার মুসলিম অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, ছিয়াম পালনকারী কুমারী কিংবা অকুমারী’ *(তাহরীম ৫)*।

এ আয়াতে আল্লাহ আদর্শ নারীর ছয়টি গুণ উল্লেখ করেছেন। যথা-

(১) মুসলিম- এমন স্ত্রী লোক যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

(২) মুমিন- যে অকৃত্রিম নিষ্ঠা সহকারে ঈমান এনেছে। অর্থাৎ যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে।

(৩) আনুগত্যশীল- আনুগত্য বলতে কোন পীর-দরবেশের আনুগত্য নয় বরং আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং স্বামীর আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে।

(৪) তওবাকারী- এমন স্ত্রী লোক যারা সর্বক্ষণ আল্লাহর নিকট নিজের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়। নিজের পাপ কর্মের জন্য সদা-সর্বদা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। এ ধরনের স্ত্রীদের মধ্যে কোন সময়ই অহংকার, গৌরব ও আত্মম্ভরিতার ভাবধারা জাগ্রত হ’তে পারে না। এমন রমণীগণ হয় নরম প্রকৃতির।

(৫) ইবাদতকারী- একজন নারীকে সর্বোত্তম হওয়ার জন্য ইবাদতগুযার হওয়া একান্তই যরূরী।

(৬) ছিয়াম পালনকারী- ফরয বা নফল ছিয়াম পালন করা অতীতের নবী ও সৎলোকদের কাজ। ছিয়াম পালন করলে প্রবৃত্তি দমন হয়। তাই ছিয়াম পালন করা আদর্শ নারীদের এক বিশেষ গুণ।

মহিলাদের সুন্দর আদর্শের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে এমন নারী যে, স্নেহপরায়না, ঘন ঘন সন্তান

প্রসবকারিণী, সমব্যথী, সান্ত্বনা প্রদানকারিণী, সহযোগিনী' *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৮৪৯, ১৯৫২)*। এ হাদীছে আদর্শ নারীর চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যথা-

(১) স্বামীর প্রতি গভীর অনুরাগী ও বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া।

(২) অধিক সন্তান প্রসব করা। দারিদ্রের ভয়ে সন্তান নেয়া বন্ধ করা যাবে না। কেননা রিযিকের মালিক আল্লাহ। তিনি সবার রিযিক দান করেন।

(৩) স্বামীর কাজে সহযোগিতা করা। অর্থাৎ স্বামীর ইবাদত-বন্দেগী হ'তে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক সব কাজে তাকে সহযোগিতা করা।

(৪) স্বামীর দুঃখে দুঃখী হওয়া ও তার ব্যথায় সমব্যথী হওয়া। উপরোক্ত চারটি গুণ লাভ করার জন্য প্রত্যেক মুসলিম মহিলাকে যত্নবান হওয়া অতীব যরূরী।

অন্য এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন,

بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيْرِ

'তোমরা কুমারীদের বিবাহ কর। কেননা তাদের মুখ বেশি মিষ্টি, তারা অধিক গর্ভধারিণী এবং অল্পে তুষ্ট' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৬২৩, ১৯৫৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, (১) স্বামীর নিকট কুমারী স্ত্রী হিসাবে থাকা যরূরী। এ বাণী দ্বারা আরো প্রতীয়মান হয় যে, 'চুন থেকে পান খসলেই' অর্থাৎ একটু অসুবিধা হ'লেই প্রথম স্বামীর ঘর-সংসার ছেড়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা শোভনীয় নয়। যদিও তা শরী'আতে জায়েয। (২) অধিক সন্তান প্রসব করতে হবে। (৩) স্বামীর সামর্থ অনুসারে সামান্য কোন জিনিসে তুষ্ট থেকে স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করতে হবে। আর এগুলি আদর্শ নারীরা ছাড়া অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

আদর্শ নারীর একটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسْطُ الطَّرِيْقِ

'নারীরা রাস্তার মধ্য দিয়ে চলাচল করবে না' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৮৫৬)*। অত্র হাদীছে আদর্শ নারীদের রাস্তায় চলার আদর্শ বর্ণিত হয়েছে। রাস্তায় চলার ব্যাপারে আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা রাস্তার মধ্যস্থল দিয়ে এদিক সেদিক

তাকিয়ে চলবে না। দৃষ্টি নত করে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলাই হচ্ছে আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ الاَّمَاظَهَرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ الاَّلِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْاَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اَخَوَتِهِنَّ اَوْنِسَائِهِنَّ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتَّبِعِيْنَا غَيْرِاُوْلِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْآاِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'আপনি মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, যা প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়নাকে তাদের বুকের উপর দিয়ে পেচিয়ে রাখে' তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ৩১)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন কর না' *(আহযাব ৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'লজ্জা হচ্ছে ঈমান। আর ঈমান হচ্ছে জান্নাত লাভের মাধ্যম' *(মিশকাত হা/৫০৭৭)*। উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলাদেরকে নিজ গৃহেই অবস্থান করতে হবে। প্রয়োজন বশত যদি তাদেরকে বাইরে যেতেই হয় তাহ'লে তাদেরকে পূর্ণ পর্দা করে যেতে হবে। মূলতঃ পর্দাই হচ্ছে মহিলাদের জন্য এক শ্রেষ্ঠ গুণ। কারণ যাদের পর্দা নেই তাদের লজ্জা-শরম নেই। আর যাদের লজ্জা নেই ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি ভালবাসা তাদের নিকট হ'তে দূরে সরে

যায়। তাই প্রত্যেক মুমিনা মহিলার জন্য কুরআন-হাদীছ অনুসারে পর্দা করা যরূরী এবং লোক দেখানো পর্দা পরিহার করা আবশ্যক।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন স্বামী স্ত্রীকে (বিশেষ প্রয়োজনে) বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা অমান্য করে। তখন স্বামী অসন্তুষ্ট হ'লে এবং ঐ অবস্থায় রাত অতিবাহিত করলে ফিরিশতাগণ সকাল পর্যন্ত ঐ স্ত্রীর উপর অভিশাপ করতে থাকে'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা অমান্য করে তাহ'লে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ঐ স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত থাকেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা৩২৪৬; বাংলা মিশকাত হা/৩১০৮)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যে, স্বামীর আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা এবং সর্বাবস্থায় স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা আদর্শ নারীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযানের ছিয়াম পালন করে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করে ও স্বামীর আনুগত্য করে, তখন সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে' *(হিলইয়া, মিশকাত হা/৩২৫৪, হাদীছ হাসান)*।

অত্র হাদীছে মহিলাদের জান্নাতে যাওয়ার চারটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। যে মহিলার মধ্যে উক্ত চারটি গুণ বিদ্যমান থাকবে সে তার ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। গুণগুলি হচ্ছে-

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা। (২) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা। (৩) লজ্জাস্থানের হিফাযত করা। অর্থাৎ অবৈধ যৌন মিলনে লিপ্ত না হওয়া। (৪) স্বামীর আনুগত্য করা। অর্থাৎ স্বামীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং স্বামী অসন্তুষ্ট হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। স্বামীর সন্তুষ্টিতে তুষ্ট থাকা। উক্ত গুণাবলী অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকা প্রত্যেক মুমিনা মহিলার জন্য যরূরী।

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلى اِمْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ সে মহিলার দিকে করুণার দৃষ্টি দেন না, যে স্বামীর শুকরিয়া আদায় করে না, আর সে স্বামীকে নিজের জন্য পরিপূর্ণ মনে করে না’ *(ত্বাবারাণী, কাবায়ির পৃঃ ২৯৩)*।

অত্র হাদীছে মহিলাদের দু’টি দোষের কথা বলা হয়েছে। (১) স্বামীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করা (২) স্বামীকে নিজের জন্য যথেষ্ট মনে না করা। মুসলিম মহিলাদের জন্য উক্ত দোষ দু’টি থেকে বেঁচে থাকা অতীব যরূরী। কেননা যে কারণে মহিলারা বেশি বেশি জাহান্নামে যাবে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮২)*।

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بنِ مَسْعُوْدٍ لَعَنَ اللّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّهِ تَعَالَى.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ্ তা‘আলা ঐসব নারীদের প্রতি অভিশাপ করেছেন, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দেহে উল্কি (সুচিবিদ্ধ করে চিত্র অংকন) করে বা অন্যের মাধ্যমে করিয়ে নেয়। যারা ভ্রূ উপড়িয়ে চিকন করে, যারা দাঁত সমূহকে শানিত ও সরু বানায়। কারণ তারা আল্লাহ্র স্বাভাবিক সৃষ্টির বিকৃতি ঘটায়’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩১)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, ‘যারা চুলে জোড়া লাগায় অথবা অন্যের দ্বারা লাগিয়ে নেয়, যে নারী দেহে কিছু অংকন করে অথবা অন্যের দ্বারা করিয়ে নেয় তাদের উভয়ের প্রতি অভিশাপ করেছেন’ *(বুখারী,মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩০, বাংলা মিশকাত হা/৪২৩৩ ৮ম খণ্ড)*।

উপরোক্ত হাদীছ দু’টিতে রাসূল কতিপয় কাজ করতে মহিলাদের বারণ করেছেন। আদর্শনারীর জন্য উক্ত কাজগুলি থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَعَنَ اللّهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

‘আল্লাহ তা‘আলা সেই সব পুরুষের প্রতি অভিশাপ করেছেন, যারা মহিলার বেশ ধারণ করে। আর ঐসব মহিলাদের প্রতিও অভিশাপ করেন, যারা পুরুষেরদ বেশ ধারণ করে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯, বাংলা মিশকাত হা/৪২৩২)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন পুরুষ মহিলার পোশাক পরিধান করতে পারে না। তেমনি কোন মহিলাও পুরুষের পোশাক পরিধান করতে পারে না। তদ্রূপ যে সমস্ত পোশাকে মাহিলাদের সাথে পুরুষের সাদৃশ্য করা হয় কিংবা পুরুষদের সাথে মহিলাদের সাদৃশ্য হয়, সেসব পরিহার করতে হবে। আদর্শ নারীর জন্য ঐসব কাজ থেকে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে একজন আদর্শ মুসলিম মহিলা কখনো পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে পারে না।

কোন এক বৈঠকে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি জাহান্নামের প্রতি লক্ষ্য করলাম দেখলাম সেখানকার অধিকাংশই নারী। ছাহাবীগণ বললে, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কি? তিনি বললেন, তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, তারা স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করে না। তুমি যদি সারা জীবন তাদের সাথে অনুগ্রহ কর, অতঃপর তোমার মধ্যে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করে, তখন বলে ফেলে আমি তোমার মধ্যে কোন কল্যাণই পাইনি' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৩৯৭)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمُرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا–

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীকে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫৫; বাংলা মিশকাত হা/৩১১৬, হাদীছ ছহীহ্)*। অত্র হাদীছে স্ত্রীর উপর স্বামীর হক্ব কতটুকু তা স্পষ্ট হয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 'স্বামী হচ্ছে মহিলাদের জন্য জাহান্নাম এবং জান্নাতের মাধ্যম' *(সিলসিলা ছহীহা হা/২৬১২, ১৯৩৪)*। অত্র হাদীছগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, আদর্শ মহিলার জন্য তার স্বামীকে রাযী-খুশি করা, আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, তার খিদমতে সর্বদা নিয়োজিত থাকা অত্যন্ত যরূরী।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন মহিলাকে আদর্শ হ'তে হ'লে নিম্নোক্ত গুণাবলী অর্জন করতে হবে। ঈমানদার, পরহেযগার, নেককার, আল্লাহভীরু, লজ্জাস্থানের হিফাযতকারিণী, সতী-সাধবী, উত্তম চরিত্রের

অধিকারিণী, অনুগত, পর্দাশীলা, দানশীলা, ছালাত আদায়কারিণী, ছিয়াম পালনকারিণী ইত্যাদি। এক কথায় যার মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ রয়েছে সেই হচ্ছে প্রকৃত আদর্শ নারী। কেননা আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

'প্রকৃত পক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে এক সর্বোত্তম আদর্শ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে, আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ২১)*।

আদর্শ স্ত্রী

একটা পরিবারকে আদর্শ করার জন্য আদর্শ স্ত্রী অপরিহার্য। পানির মধ্যে চলাচল করলে পা ভিজবে না এটা যেমন অবাস্তব, তেমন আদর্শ স্ত্রী ছাড়া আদর্শ পরিবারের কামনা করা অবাস্তব। যদিও হয় তবে তা খুব কম হবে। কুরআনে দুইজন আদর্শ নারীর চরিত্র ও নমুনা পেশ করা হয়েছে। যে আদর্শের অনুসরণ করা ঈমানদার নারীদের জন্য আবশ্যক। তার একজন হচ্ছেন ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া। ফেরাউন ছিল স্বৈরাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী, নির্যাতনকারী, আল্লাহ্দ্রোহী, লৌহ শলাকাধারী প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট। পৃথিবীর ইতিহাসে সে ছিল আল্লাহ্র প্রকাশ্য দুশমন। অথচ তার স্ত্রী ছিলেন আল্লাহ্র দ্বীনের পূর্ণ ও শক্তিশালী ঈমানদার। ফেরাউন তাঁর উপর চাঁপ সৃষ্টি করেছিল তাকে প্রতিপালক হিসাবে মেনে নেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমার প্রতিপালক, আপনার প্রতিপালক এবং সকল বস্তুর প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ্। তখন ফেরাউন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে খুব কঠিন শাস্তি দিয়েছিল। ফের'আউন তার চার হাত-পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর পাথর চাঁপিয়ে শাস্তি দিত। তিনি এই আল্লাহ্ বিরোধী কঠোর মেজাযী সম্রাটের আধিপত্য থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কাতর কণ্ঠে দো'আ করতে থাকতেন। তিনি অমানবিক শাস্তি র শিকার হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হয়ে সদাসর্বদা আল্লাহ্কে ডাকতেন। এটা নারীদের জন্য অনুকরণীয় এক বিরল আদর্শ।

এই আল্লাহ্ বিশ্বাসী মহিলাকে দুনিয়ার সব মহিলার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা পেশ করেছেন।

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

'আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করেছেন। ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া দো'আ করে বললেন, হে আল্লাহ্! আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে মুক্তি দাও। মুক্তি দাও আমাকে অত্যাচারী লোকদের নির্যাতন থেকে' *(তাহরীম ১১)*।

মুমিন নারী-পুরুষের অবস্থা কি হ'তে পারে তা দেখার ও তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরাউনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করেছেন। প্রতাপশালী ফেরাউনের কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হয়েও আছিয়া চরম ঈমানের পরিচয় দিয়েছেন, যা মুমিন নারী-পুরুষের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি চূড়ান্ত ঈমানের পরিচয় দিয়ে আল্লাহর নিকট ঘর বানানোর আবেদন করেছেন এবং ফেরাউন ও তার অত্যাচারী সম্প্রদায় হ'তে বাঁচতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঈসা (আঃ)-এর মা মরিয়মের আদর্শ। তিনি ছিলেন পবিত্রতা, সততা ও আল্লাহ্ ভীরুতার জ্বলন্ত প্রতীক। আল্লাহ্র বাণী,

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾

'আর ইমরান কন্যা মরিয়ম, যিনি তাঁর যৌনাঙ্গের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তখন আমি তার মধ্যে আমার থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছি। তিনি তার প্রতিপালকের সব কথা ও তাঁর কেতাবসমূহের সত্যতা মেনে নিয়েছেন। বস্তুত তিনি ছিলেন নিয়মিত ইবাদতকারিণী, আল্লাহ্র আদেশ পালনকারী বিনয়ী লোকদের অন্তর্ভুক্ত' *(তাহরীম ১২)*। অত্র আয়াতে মারিয়ামের চূড়ান্ত ঈমানের তিনটি পরিচয় দেয়অ হয়েছে- (১) যৌনাঙ্গের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারিণী। যেনা তাকে স্পর্শ করেনি। (২) তিনি তার প্রতিপালকের সব কথা ও তার কেতাব সমূহের প্রতি অটল বিশ্বাসী ছিলেন। (৩) নিয়মিত ইবাদতে ছিলেন অতুলনীয়।

আদর্শ নারী-পুরুষের জন্য এই আয়াতদ্বয় এক বাস্তব উদাহরণ।

আল্লাহ্ তা‘আলা আদর্শস্ত্রীর গুণ উল্লেখ করে বলেন,

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾

‘অতএব যারা সতী-সাধবী স্ত্রীলোক, তারা তাদের স্বামীদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম পালনকারী এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে গোপনীয় বিষয়গুলির হেফাযতকারী হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ নিজেই তার হেফাযত করেন’ *(নিসা ৩৪)*।

আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে সতী-সাধবী আদর্শ স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছেন যারা স্বামীর আনুগত্য করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে হেফাযত করে।

আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً﴾

‘নবী যদি আপনাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেন, তাহ’লে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ নবী ﷺ কে তোমাদের পরিবর্তে এমন সব স্ত্রী দিবেন যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে। যারা হবে সত্যিকার মুসলিম, আনুগত্যশীল, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, ছিয়াম পালনকারী, কুমারী কিংবা অকুমারী’ *(তাহরীম ৫)*।

এখানে আদর্শস্ত্রীর ছয়টি গুণ পেশ করা হয়েছে।

(১) ‘মুসলিম’ মুসলিম শব্দটির অর্থ হচ্ছে কার্যত আল্লাহ্র হুকুম ও আইন-বিধান পালনকারী। তারা এমন স্ত্রী হবে যারা আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

(২) ‘মুমিন’ মুমিন বলতে এমন লোককে বুঝায় যে অকৃত্রিম নিষ্ঠা সহকারে ঈমান গ্রহণ করেছে। অতএব মুমিন স্ত্রীর বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, সত্য হৃদয়ে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি ঈমান রাখে। আর কার্যত নিজের চরিত্র, অভ্যাস-আদত, আচার-আচরণ ও ব্যবহারে আল্লাহ্র দ্বীন অনুসরণ করে চলে।

(৩) 'আনুগত্যশীল' এই শব্দের দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে গ্রহণীয়। প্রথম তারা এমন স্ত্রী হবে যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের অনুগত ও আদেশ পালনকারী হবে। দ্বিতীয়তঃ তারা হবে নিজের স্বামীর অনুগত।

(৪) 'তাওবাকারী' তারা এমন স্ত্রী হবে যারা সবসময়ই আল্লাহ্‌র কাছে নিজের গুনাহ ও অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়। নিজের দুর্বলতাও পদস্খলনের অনুভূতি সবসময় দংশন করে এবং সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। এ ধরনের স্ত্রীর মধ্যে কোন সময়ই অহংকার, গৌরব, অহমিকতা, উন্নাসিকতা ও আত্মম্ভরিতার ভাবধারা জাগতে পারে না। এমন স্ত্রী স্বভাবতই নম্র প্রকৃতির এবং বিনীত মনোভাবের হয়।

(৫) 'ইবাদতকারী' একজন নারীর সর্বোত্তম হওয়ার ব্যাপারে এই জিনিসের খুব বেশি প্রভাব লক্ষ করা যায়। এমন স্ত্রী ইবাদত করার কারণে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ পুরাপুরি রক্ষা করে চলে। এমন স্ত্রী কখনোই আল্লাহ্‌রই এবাদত করা থেকে মুখ ফিরাবে না- এ আশা তার প্রতি খুব বেশি করা যায়।

(৬) 'ছিয়াম পালনকারী' ফরয বা নফল ছিয়াম পালন করা অতীতের নবী ও সৎ লোকদের কাজ। ছিয়াম পালন করলে প্রবৃত্তি দমন হয়। ছিয়াম পালনে অভ্যস্থ স্ত্রীর কাছে সবধরনের কল্যাণের আশা করা যায়। এ যাবত আদর্শ স্ত্রীর যেসব গুণাবলী পেশ করা হ'ল, সেগুলি পরিপূর্ণভাবে অর্জন করার জন্য সচেষ্ট থাকা প্রত্যেক নারীর কর্তব্য। আল্লাহ্ তুমি তাওফীক দান কর।

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ–

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, 'পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণ ঈমানদার হয়েছেন কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া ব্যতীত আর কেউ পূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারেনি'। তিনি আরো বলেছেন, 'সব নারীর উপর আয়েশার মর্যাদা এমন যেমন সব রকমের খাদ্য সামগ্রির উপর ছারীদের মর্যাদা' *(বুখারী হা/৩৪১১, মুসলিম হা/৪৪৫৯,*

মিশকাত হা/৫৭২৪, বাংলা মিশকাত হা/৫৪৭৯)। রুটি টুকরা টুকরা করে গোশতের ঝোলের মধ্যে ভিজিয়ে দেওয়াকে ছারীদ বলে।

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِـيَ اللهُ عَـنْهُمْ عَـنِ النَّبِـيِّ ﷺ قَـالَ خَيْـرُ نِـسَائِهَا مَـرْيَمُ وَخَيْـرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ–

আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, 'মারইয়াম বিনতু ইমরান হচ্ছেন সমস্ত নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ হচ্ছেন বর্তমান দুনিয়ার সমস্ত নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' *(বুখারী হা/৩৮১৫, মুসলিম হা/৪৪৫৮, মিশকাত হা/৬১৭৫, বাংলা মিশকাত হা/৫৯২৪)*।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـالَ حَـسْبُكَ مِـنْ نِـسَاءِ الْعَـالَمِينَ مَـرْيَمُ ابْنَـةُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'সারা বিশ্বের মহিলাদের মধ্য থেকে এই চারজন মহিলার ফযীলত সম্পর্কে তোমার অবগত হওয়া যথেষ্ট। তাঁরা হচ্ছেন ইমরানের মেয়ে মারইয়াম, খুওয়াইলেদের মেয়ে খাদীজা, মুহাম্মদ ﷺ এর মেয়ে ফাতিমা এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া' *(তিরমিযী হা/৩৮৭৮, মিশকাত হা/৬১৮, বাংলা মিশকাত হা/৫৯৩০)*।

অত্র হাদীছে রাসূল ﷺ এই চারজন নারীর মর্যাদা সম্পর্কে জানতে বলেছেন। কারণ কোন নারী বা পুরুষ প্রকৃতপক্ষে আদর্শও আল্লাহ্ ভীরু হ'তে চাইলে এসব নারীদের ইতিহাস অবগত হওয়া অপরিহার্য। কোন নারী যদি তার সতীত্ব যথাযথভাবে রক্ষা করতে চায়, কঠিন দুর্বিসহ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে চায় এবং পরিবারকে আদর্শকরতে চায়, তাহ'লে তার জন্য মারইয়াম ও আছিয়ার ঈমানী আদর্শ অবগত হওয়া যরূরী।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِـيِّ صـلى الله عليـه وسـلم فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ هَـذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ وَطَعَامٌ فَإِذَا أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِـنْ رَّبِّهَـا وَمِنِّـيْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَلاَ صَخَبٍ فِيْهِ وَلاَنَصَبٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা জিরাঈল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এস বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (ছাঃ)! এই যে, দেখছেন খাদীজা একটি পাত্র নিয়ে আসছেন। তাতে তরকারী এবং খাদ্যদ্রব্য রয়েছে। তিনি যখন আপনার নিকট আসবেন, তখন আপনি তাকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে এবং আমার পক্ষ হ'তে সালাম দেবেন এবং তাকে জান্নাতের মধ্যে মুক্তা খচিত এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ প্রদান করবেন যেখানে নেই কোন হৈ হুল্লোড়, নেই কোন কষ্ট-ক্লেশ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯২৫)*। অত্র হাদীছে খাদীজা (রাঃ) যে অনুকরণীয়া, অনুস্মরণীয়া, এক চূড়ান্ত উত্তম আদর্শের অধিকারিণী মহিলা তা স্পষ্টরূপে ফটে উঠেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাকে সালাম দিয়েছেন, জিবরাইল (আঃ) তাকে সালাম দিয়েছেন। জিবরাঈল (আঃ) তাকে জান্নাতের সুসংবাদও প্রদান করেছেন। একজন মহিলার মর্যাদা আল্লাহর নিকট কত বেশী হলে আল্লাহ তাকে এভাবে মূল্যায়ন করেন তা ভাবার বিষয়।

عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ...فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى فَقَالَت خَدِيْجَةُ كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلَ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِيْ الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الَحَقَّ فَانْطَلَقَ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلَ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) খাদীজার নিকট এসে বললেন, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর। তিনি তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। তারপর তার কিছু ভিতি দূর হ'ল। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ)-এর নিকট ঘটনা আদ্যোপান্ত জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার ব্যাপারে ভয় করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! কখনো (আপনার কোন ভয়ের কোন কারণ নেই) আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কারণ আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করেন, অসহায় দুঃস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথে দুদর্শাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। অতঃপর খাদীজা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে তার

চাচাত ভাই ওয়ারাকাহ ইবনে নওফালের নিকট নিয়ে গেলেন *(বুখারী হা/৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অতি বুদ্ধিমতি আদর্শ স্ত্রীর নিকট গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথা বলতে পারে। আদর্শ স্ত্রী হ'লে স্বামী তার কাছে পরামর্শ চাইতে পারে। একমাত্র আদর্শ নারী খুব ভয়-ভীতি ও সংকটময় মুহূর্তে স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে পারে এবং জটিল বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্য কোন ব্যক্তির কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিতে পারে। আর এসব কারণেই খাদীজা (রাঃ) মুসলিম নারীদের জন্য অনুকরণীয় এক অনুপম আদর্শ হিসাবে খ্যাতিমান হয়ে আছেন।

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشُ هَذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرَى مَالاَ نَرَى.

আবু সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আয়েশা! এই যে, জিবরাঈল তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়েশা (রাঃ) বললেন, وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ তাঁর উপরও সালাম এবং রহমত বর্ষিত হোক। রাসূল (ছাঃ) যা দেখতে পান, আমরা তা দেখতে পাই না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯২৭)*।

যাকে জিবরাঈল (আঃ) সালাম দেন তিনি কত বড় সৌভাগ্যবতি আদর্শ নারী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব নারী হচ্ছেন নারীদের জন্য চির অনুসরণীয়।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْتُكِ فِيْ الْمَنَامِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يَجِيْءُ بِكِ الْمَلَكُ فِيْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَقَالَ لِيْ هَذِهِ إِمْرَأَتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يَمْضِهُ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তোমাকে তিন রাত আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আসেন এবং আমাকে বলেন, এই আপনার স্ত্রী। তখন আমি তোমার মুখের কাপড় সরিয়ে দেখি তুমি আয়েশা। অতঃপর আমি মনে মনে বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহ'লে অবশ্যই তা একদিন পূর্ণ হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯২৮)*।

অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, আয়েশা (রাঃ) এক ব্যতিক্রমী আদর্শের অধিকারী নারী। কারণ আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং তাকে নবীর স্ত্রী হিসাবে পসন্দ করেছিলেন। যে কারণে জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখানো হয় এবং জিবরাঈল (আঃ) বলেন, এই আপনার স্ত্রী। অন্য বর্ণনায় রয়েছে জিবরাঈল (আঃ) আয়েশাকে এক সবুজ রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে এনে নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, ইহকালে ও পরকালে ইনি আপনার স্ত্রী *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৯৩১)*।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَبَ رَسُوْلِ اللهِ حَدِيْثٌ قَطٌّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا.

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ যখনই কোন মাসআলা নিয়ে সমস্যায় পড়তাম তখনই আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করতাম এবং তার সঠিক সমাধান পেতাম *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৯৩৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শরী‘আত সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারিণী। সকল ছাহাবী তাঁকে শরী‘আত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। আদর্শ নারীদের কাজ হবে জ্ঞান চর্চা করা এবং মহিলাদের শিক্ষা দেয়া। নারীদের জ্ঞান অর্জন করা এবং অন্যদের তালীম দেয়ার ব্যাপারে পৃথিবীর এক অদ্বিতীয় নমুনা হচ্ছেন আয়েশা (রাঃ)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضــ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيْمُ إِلاَّ ثَــلاَثُ كَــذَابٍ، ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِيْ ذَاتِ اللهِ قَوْلُهُ إِنِّي سَقِيْمٌ وَ قَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَذَا وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتُ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ عَلَى جَبَابِرَةَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ هَهُنَا رَجُلاً مَعَهُ إِمْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا مَنْ هَذِهِ قَالَ أُخْتِيْ فَأَتَى سَارَةً فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي يَغْلِبْنِيْ عَلَيْكِ فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيْهِ إِنَّكِ أُخْتِيْ فَإِنَّكِ أُخْتِيْ فِي الإِسْلاَمِ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِيْ وَ غَيْرُكِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُتِيَ بِهَا قَامَ ابْرَاهِيْمُ يُــصَلِّي فَلَمَّادَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأَخَذَ وَ يُرْوَي فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ فَقَالَ أُدعِيْ اللهَ لِيْ وَلاَ أَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللهَ فَأُطْلِكَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأَخَذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ فَقَالَ أُدْعِيْ

اللهَ لِيْ وَلاَ أَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللهَ فَأُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِه فَقَالَ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِيْ بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتَنِيْ بِشَيْطَانٍ فَأَخَذَ مَعَهَا هَاجِرَ فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ مَهْيَمَ قَالَتْ رَدَّ اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِيْ نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هَاجَرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِى مَاءِ السَّمَاءِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) তিনবার ব্যতীত কখনো মিথ্যা বলেননি। এর মধ্যে দু'বার ছিল শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। তার প্রথমটি ছিল লোকজন তাঁকে মেলা উৎসবে যেতে বললে তিনি বলেন, 'আমি অসুস্থ'। আর তাঁর অপর কথাটি ছিল বরং তাদের বড় মূর্তিটিই একাজ করেছে। আর একটি ছিল তার নিজস্ব ব্যাপারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, একদা ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী সারা এক যালিম শাসনকর্তার এলাকায় এসে পৌঁচলেন। শাসনকর্তাকে খবর দেয়া হ'ল যে, এখানে একজন লোক এসেছে, তার সঙ্গে আছে অতি সুন্দরী এক রমনী। রাজা তখন ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে লোক পাঠাল। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল এ রমনীটি কে? ইবরাহীম (আঃ) বললেন, সে আমার দ্বীনি বোন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) সারার কাছে আসলেন এবং তাঁকে বললেন, হে সারা! যদি এ অত্যাচারী শাসক জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী তাহ'লে সে তোমাকে আমার নিকট হ'তে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবে। সুতরাং যদি সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তুমি বলবে যে, তুমি আমার বোন। মূলতঃ তুমি আমার দ্বীনী বোন। কেননা আমি ও তুমি ছাড়া এ যমীনের উপর আর কোন মুমিন নেই। এবার শাসনকর্তা সারার নিকট লোক পাঠাল। সারাকে যালিম শাসকের নিকট উপস্থিত করা হ'ল। অপরদিকে ইবরাহীম (আঃ) ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর সারা যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন রাজা তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াল, তখনই সে আল্লাহর গযবে পাকড়াও হ'ল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার দম বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি যমীনে পা মারতে লাগল। যালিম শাসক নিজের অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা আল্লাহর কাছে তার জন্য দো'আ করলেন ফলে সে মুক্তি পেল। অতঃপর সে দ্বিতীয় বার তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াল। তখন সে পূর্বের ন্যায় কিংবা আরো কঠিনভাবে পাকড়াও হ'ল। এবারও রাজা বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ কর আমি তোমার কোন ক্ষতি

করব না। সুতরাং সারা আবারো তার জন্য আল্লাহর কাছে দো‘আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। তখন শাসক একজন পাহারাদার ডেকে বলল, তোমরাতো আমার কাছে কোন মানুষকে আননি বরং তোমরা আমার কাছে এনেছ শয়তান। তারপর সে সারার খিদমতের জন্র হাজেরা নামে একজন রমনীকে দান করল। অতঃপর সারা ইবরাহীমের কাছে ফিরে আসলেন, তখনও ইবরাহীম (আঃ) ছালাত আদায় করছেন। ঘটনা কি হ’ল? সারা বললেন, আল্লাহ কাফেরের চক্রান্ত তার প্রতি উল্টো চাপিয়ে দিয়ে তার ষড়যন্তকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং সে আমার খিদমতের জন্য হাজেরাকে দান করেছেন। হাদীছটি বর্ণনা করার পর আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হে আরববাসীগণ! এ হাজেরাই তোমাদের আদি মাতা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬০)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সারা অনুসরণীয় এক বিরল আদর্শের অধিকারী মহিলা ছিলেন। কারণ সকল ভাল মহিলাই কোন না কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু সারার মত নয়। সারা তাঁর মান ইয্যতের ব্যাপারে সরাসরি এক অত্যাচারী লম্পট শাসকের হাতে পড়েছিলেন এবং শাসক খারাপ উদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়িয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দেন। সে তখন মাটিতে পা ছুড়তে থাকে এবং নিজের শোচনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে সারাকে আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা চাইতে বলে এবং তার কোন ক্ষতি করবে না বলে অঙ্গীকার করে। এভাবে আল্লাহ যালিম বাদশার অসৎ উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে দেন এবং সারার ইযযত রক্ষা করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সারা ছিলেন একজন মুত্তাক্বী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্ত মহিলা। যার ফলে তার দো‘আ কবুল হয়েছিল এবং তিনি তার ইয্যত-আব্রু রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এখনো যে কোন মহিলা তার তাকওয়া ও পরহেযগারিতার মাধ্যমে যে কোন বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। প্রত্যেক মুসলিম নারীর উচিত এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। কেননা দেশে যেনা-ব্যভিচারের সয়লাব চলছে, এ পরিত্রাণের জন্য যে কোন নারী তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে। পর্দার বিধান যথাযথভাবে পালন করে পরহেযগারিতার চরম শিখরে পৌঁছতে পারে। উপরোক্ত ঘটনা তার জলন্ত প্রমাণ। আল্লাহ তুমি মহিলাদের উপরোক্ত গুণাবলী অর্জনের তাওফীক্ব দান কর।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلُ مَا اتذَخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ إِسْمَعِيْلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ أَثَهَا عَلَ سَارَةٍ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَهِيْمُ وَ بِابْنِهَا إِسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تَرْضَعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِيْ أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَمْرٌ وَ سِقَاءً فِيْهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفَّى إِبْرَهِيْمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ فَقَالَتْ يَا إِبْرَهِيْمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِيْ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْهِ إِنْسٌ وَلاَ شَيْئٌ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ اللهُ الَّذِيْ أَمَرَكَ بِهَذا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِذَنْ لاَيُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ إِبْرَهِيْمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتِ ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبَّنَا إِلَى أَسكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ ذَرعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নারী জাতি সর্ব প্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাঈল (আঃ)-এর মায়ের নিকট থেকে। হাযেরা (রাঃ) কোমরবন্দ লাগাতেন, সারা (আঃ) থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) হাযেরা (আঃ) এবং তাঁর শিশু পুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে বের হ'লেন। এমতাবস্থায় যে, হাযেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত হ'ল ইবরাহীম (আঃ) তাদের দু'জনকে সেখানে নিয়ে আসলেন এবং মসজিদের উচু অংশে যেখানে এখন যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে একটি বড় গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন খাদ্য, না ছিল কোনরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে চলে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের নিকট রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর ও একটি মশকে কিছু পানি। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) ফিরে চললেন। তখন হাযেরা তাঁর পিছে পিছে যেতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী, আর না আছে খাদ্যের ব্যবস্থা। তিনি একথা তাঁকে বার বার বলতে লাগলেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাযেরা নিরুপায় হয়ে বললেন, আল্লাহ কি আপনাকে এভাবে চলে যেতে বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাযেরা বললেন, তাহ'লে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। তারপর হাযেরা ছেলের নিকট ফিরে আসলেন।

আর ইবরাহীম (আঃ) সামনের দিকে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের এমন বাঁকে পৌঁছলেন, যেখান থেকে স্ত্রী ও সন্তানকে আর দেখা যাচ্ছে না কিংবা তারাও তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি দু'হাত তুলে প্রার্থনা শুরু করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতককে আপনার সম্মানিত কা'বা ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় রেখে গেলাম। হে আমার প্রতিপালক! যাতে তারা ছালাত কায়েম করতে পারে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, যেন তারা আপনার শুকরিয়া আদায় করতে পারে *(ইবরাহীম ৩৭)*। আর ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে স্বীয় স্তনের দূধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকের পানি ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে তৃষ্ণার্ত হ'লেন এবং তাঁর শিশু পুত্রও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির দিকে দেখতে লাগলেন। তৃষ্ণায় তার বুক ধড়ফড় করছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশু পুত্রের এ করুণ অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন আর তাঁর অবস্থানের নিকটবর্তী পর্বত 'ছাফা'কে একমাত্র তাঁর নিকটতম পর্বত হিসাবে পেলেন। অতঃপর তিনি তার উপর উঠে দাঁড়ালেন এবং ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিক সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও কাউকে দেখা যায় কি-না? কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন 'ছাফা' পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমনকি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের মত ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দান অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ের নিকট এসে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর এদিক সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কি-না? কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এজন্যই মানুষ এ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সাঈ করে থাকে। অতঃপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছ। যদি তোমার নিকট কোন সাহায্যকারী থাকে। হঠাৎ যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা তার পায়ের গোড়ালী দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলেছেন, স্বীয় ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হ'তে লাগল। তখন হাযেরা

(আঃ) এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে এক হাউজের মত করে দিলেন এবং হাতের কোষভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপচে উঠছিল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহ'লে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবাহমান ঝর্ণায় পরিণত হ'ত। রাবী বলেন, অতঃপর হাযেরা (আঃ) পানি পান করলেন এবং শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন, তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন আশঙ্কা করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে মিলে এখানে ঘর নির্মাণ করবেন এবং আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনো ধ্বংস করেন না। ঐ সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার মত উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। অতঃপর হাযেরা (আঃ) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিকে আসছিল। তারা মক্কায় নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে পাঠাল। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হ'ল। রাবী বলেন, ইসমাঈল (আঃ)-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তবে এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করল।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। অতঃপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদেরও কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হ'ল। আর ইসমাঈলও যৌবনে উপনীত হ'লেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের নিকট অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। অতঃপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে

তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাঈলের মা হাযেরা (আঃ) ইন্তিকাল করেন। ইসমাঈলের বিবাহের পর ইবরাহীম (আঃ) তাঁর রেখে যাওয়া পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি এসে ইসমাঈলকে পেলেন না। তিনি ইসমাঈলের স্ত্রীকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি পুত্রবধূকে তাদের জীবন যাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমরা অতি দূরবস্থায়, অত্যন্ত টানাটনি ও খুব কষ্টে আছি। সে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসলে, তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। অতঃপর যখন ইসমাঈল বাড়ী আসলেন, তখন তিনি যেন কিছুটা আভাস পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁকে জানালাম, আমারা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাঈল (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন নছীহত করেছেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, তিনি আমার পিতা। এ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। অতএব তুমি তোমার আপনজনদের নিকট চলে যাও। এ কথা বলে ইসমাঈল (আঃ) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ লোকদের থেকে অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) এদের থেকে দূরে রইলেন, আল্লাহ যতদিন চাইলেন। অতঃপর তিনি আবার এদের দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈল (আঃ)-এর দেখা পেলেন না। তিনি পুত্রবধূর নিকট উপস্থিত হ'লেন এবং তাঁকে ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ইবরাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের জীবন যাপন ও অবস্থা জানতে চাইলেন। তখন সে বলল, আমরা ভাল ও স্বচ্ছল অবস্থায় আছি। আর সে আল্লাহর প্রশংসাও করল। ইবরাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কি? সে বলল, গোশ্‌ত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি? সে বলল, পানি। ইবরাহীম (আঃ) দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের গোশ্‌ত ও

পানিতে বরকত দাও। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ঐ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হ'ত না। যদি হ'ত তাহ'লে ইবরাহীম (আঃ) সে বিষয়েও তাদের জন্য দো'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশ্ত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারে না। কেননা শুধু গোশ্ত ও পানি জীবন যাপনের অনুকূল হ'তে পারে না।

ইবরাহীম (আঃ) বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে, তখন তাঁকে আমার সালাম বলবে, আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে যে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কেউ এসছিলেন কি? সে বলল, হ্যাঁ একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর প্রশংসা করল, তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। অতঃপর তিনি আমার নিকট আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা ভাল আছি। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন কিছুর জন্য আদেশ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, তিনিই আমার পিতা। আর তুমি হ'লে আমার ঘরের চৌকাঠ। একথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি।

অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) তাদের থেকে দূরে রইলেন, যতদিন আল্লাহ চাইলেন। এরপর তিনি আবার আসলেন। (দেখতে পেলেন) যমযম কূপের নিকটস্থ একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাঈল (আঃ) তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর একজন বাপ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে যেমন করে থাকে তাঁরা উভয়ে তাই করলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, আপনার রব আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল (আঃ) বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে। তখনি তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়াল তুলতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল (আঃ) পাথর আনতেন, আর ইবরাহীম (আঃ) নির্মাণ করতেন। পরিশেষে যখন দেয়াল উঁচু

হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আঃ) (মাকামে ইবরাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম (আঃ) তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল (আঃ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তখন তারা উভয়ে এ দো'আ করতে থাকলেন, হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। তাঁরা উভয়ে আবার কা'বা ঘর তৈরী করতে থাকেন এবং কা'বা ঘরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে এ দো'আ করতে থাকেন, 'হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন' *(বাক্বারাহ ১২৭; বুখারী হা/২৩৬৮)*।

অত্র হাদীছে হাযেরার ঈমানী পরীক্ষা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কোন খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা না থাকলেও আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন না এ বিশ্বাস তার অন্তরে দৃঢ়ভাবে ছিল। এমনকি এই জন-মানবহীন প্রান্তরে, অনুর্বর উপত্যকায় তিনি থাকতে পারবেন বলেও জোরাল কণ্ঠে প্রকাশ করলেন। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হ'লেই কেবল মানুষ এরূপ বলতে পারে। পৃথিবীর সকল নারীর উচিত আল্লাহর প্রতি ঐরূপ বিশ্বাসী হওয়া, যেরূপ বিশ্বাসী ছিলেন হাযেরা (রাঃ)। হাযেরা (রাঃ)-এর আদর্শ নারীরা গ্রহণ করলে তাদের জীবনে প্রভূত সফলতা আসবে।

রাসূল (ছাঃ) এই চারজন নারীর মর্যাদা সম্পর্কে জানতে বলেছেন। কারণ কোন নারী প্রকৃত পক্ষে আদর্শ ও আল্লাহভীরু হ'তে চাইলে এসব নারীদের ইতিহাস অবগত হওয়া অপরিহার্য। কোন নারী তার সতিত্বকে রক্ষা করে ঈমান ও পরহেযগারিতার সাথে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্য এসব নারীর জীবনী সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে সে অনুযায়ী আমল করা একান্ত যরূরী।

নারীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শের অধিকারী আরেকজন মহিলা হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতিমা। তার বিনয়-নম্রতা, শালীন আচরণ, ইবাদত-বন্দেগী, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা প্রভৃতি আদর্শের কারণে রাসূল (ছাঃ) তাকে জান্নাতী নারীদের অন্যতম নেত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। এমর্মে নিম্নোক্ত হাদীছটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

عَنْ أمِّ سَلَمَةَ أنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الْفَتْحِ فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ سَأَلْتُ عَنْ بُكَائِهَا وَضِحْكِهَا فَقَالَتْ أَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِيْ أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إلاَّ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ.

উম্মু সালমা (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের পর একদিন রাসূল (ছাঃ) ফাতিমাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে চুপে চুপে কিছু কথা বললেন। তা শুনে ফাতিমা কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তিনি পুনরায় তাঁর সাথে কথা বললেন, এবার ফাতিমা (রাঃ) হেসে উঠলেন। উম্মু সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর আমি ফাতিমাকে ঐদিন কাঁদার এবং হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, অচিরেই তিনি ইন্তেকাল করবেন, তা শুনে আমি কেঁদেছিলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, ঈসা (আঃ)-এর মা মরিয়ম বতীত জান্নাতের সকল নারীদের সরদার আমি হব *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ হা/৫৯৩৩)*। পৃথিবীতে যেসব মহিলার আদর্শ অনুসরণীয় মহিলা ছিলেন ফাতিমা (রাঃ) তাদের অন্যতম। তিনি খুব নম্র স্বভাবের এবং অত্যন্ত পরহেযগার মহিলা ছিলেন।

عَنْ ابن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ النبي فِي الْجَنَّةِ وَالصِّدِّيْقُ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِي الْجَنَّةِ وَالمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ والرَّجُلُ يَزُوْرُ أَخَاهُ فِيْ نَاحِيَةِ المِصْرِ لاَ يَزُوْرُهُ إلاَّ للّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنِسائُكُمْ مِن أهلِ الجَنَّةِ الوَدُودُ الْمَولُودُ العَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِيْ إِذَا غَضَبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا وَتَقُوْلُ لاَ اَذُوْقُ غَمَضًا حَتَّى تَرْضَى-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসী পুরুষদের সংবাদ দিব না? নবী জান্নাতী, সত্যবাদী জান্নাতী, শহীদ জান্নাতী, নবজাতক শিশু জান্নাতী, একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীনি ভাইয়ের সাক্ষাৎকারী জান্নাতী। আর ঐসব স্ত্রীগণ হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী যারা বন্ধুভাবাপন্ন, স্নেহপরায়ণ, বেশি বেশি সন্তান প্রসবকারিণী, স্বামীর প্রতি বারংবার গভীর প্রেম বিনিময়কারিণী। কোন সময় স্বামী রাগান্বিত হ'লে, স্বামীর হাতে হাত

রেখে বলে, আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জন না করা পর্যন্ত কোন খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করবো না' *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৮৭)*।

অত্র হাদীছে এমন নারীর আদর্শ প্রকাশ হয়েছে যারা জান্নাতী। হাদীছে চারটি গুণের অধিকারিণী নারীকে জান্নাতী বলা হয়েছে। (১) স্বামীকে খুব বেশি ভালবাসা, (২) ঘন ঘন সন্তান প্রসব করা (৩) স্বামীর সাথে বারংবার গভীর প্রেম বিনিময়ে অনুরাগী হওয়া (৪) স্বামী কোন কারণবশত রাগান্বিত হ'লে স্বামীকে রাযী-খুশী না করা পর্যন্ত খাদ্য না খাওয়ার দৃঢ় পরিকল্পনা করা। এগুলি আদর্শ নারীর পরিচয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسْطُ الطَّرِيْقِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নারীরা রাস্তার মধ্য দিয়ে চলাচল করবে না' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৮৫৬)*।

এখানে নারীদের রাস্তায় চলার আদর্শ বর্ণনা করা হয়েছে। আদর্শ নারীর পরিচয় হচ্ছে তারা রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলাচল করবে। বর্তমান সমাজে এই হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা হচ্ছে।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أربَعٌ مِنْ السَّعَادَةِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الهنئُ وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ اَلْجَارُ السُّوْءُ وَالْمَرْأَةُ السُّوْءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوْءُ وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ–

সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সৌভাগ্যবান হওয়ার চারটি জিনিস রয়েছে- (১) সতী-সাধ্বী স্ত্রী (২) প্রসস্থ বাসস্থান (৩) সৎ ও উপযুক্ত প্রতিবেশী (৪) আরামদায়ক যানবাহন। আর দুর্ভাগ্যবান হওয়ার চারটি জিনিস রয়েছে- (১) খারাপ প্রতিবেশী (২) মন্দ আচরণের স্ত্রী (৩) বিপদজনক যানবাহন (৪) সংকীর্ণ বাসস্থল' *(সিলসিলা ছহীহা হা/২৮৩, ১৯০৩)*। এখানে এমন ব্যক্তিকে সৌভাগ্যবান বলা হয়েছে, যার স্ত্রী সতী-সাধ্বী পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী। যার স্ত্রী আদর্শহীন তাকে দূর্ভাগ্যবান বলা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِيْ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কে সবচেয়ে উত্তম নারী? রাসূল ﷺ বললেন, ‘যে স্ত্রী তার স্বামীকে খুশী করতে পারে, স্বামী যখন তার দিকে লক্ষ্য করে। স্বামী যখন তাকে আদেশ করে, তখন স্বামীর আদেশ যথাযথ মান্য করে। আর তার নিজের ব্যাপারে এবং নিজের সম্পদের ব্যাপারে স্বামী যা অপসন্দ করে সে তা করে না’ *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৮৩৮/১৯১৬)*। এখানে আদর্শনারীর তিনটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে (১) এমন হাসি মুখে থাকা, স্বামী দৃষ্টি দিলেই যেন খুশী হয়। (২) সদাসর্বদা স্বামীর আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকা (৩) নিজের ব্যাপারে এবং নিজের অর্থের ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছার বিরোধিতা না করা।

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ إِسْمُهَا أَسْمَاءُ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ لِبَعِضِ الْحَاجَةِ فَقَضَى حَاجَتَهَا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ مَا أَلُوْهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ أُنْظُرِيْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ-

হুছায়েন ইবনে মেহছান তার ফুফু আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তার ফুফু একদা তার কোন প্রয়োজনের জন্য রাসূল ﷺ এর কাছে গেলেন। রাসূল ﷺ তার প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, ‘তোমার স্বামী আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি তার কেমন স্ত্রী? সে বলল, আমি তার খিদমত করতে কম করি না, তবে আমি তার ব্যাপারে অপারগ হই। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি যা বলছ, সে ব্যাপারে চিন্তা কর, তুমি তার থেকে কোথায় যাবে? নিশ্চয়ই সে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম’ *(সিলসিলা ছহীহা হা/২৬১২, ১৯৩৪)*।

অত্র হাদীছে স্ত্রীদেরকে তিনটি বিষয়ে বলা হয়েছে।

(১) স্ত্রীকে স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

(২) স্বামীর খিদমত করার জন্য যথাযথ চেষ্টা করতে হবে।

(৩) কোন সময় তার নিকট অপারগতা প্রকাশ করা যাবে না। কারণ স্বামী হচ্ছে জাহান্নাম ও জান্নাতের মাধ্যম। একমাত্র আদর্শস্ত্রী এগুলি পালন করে থাকে।

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرُ نِسَائكُمْ اَلْوَدُوْدُ الْمَوْلُوْدُ الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ–

রাসূল ﷺ বলেন, ‘তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে এমন নারী যারা স্নেহপরায়না, ঘনঘন সন্তান প্রসবকারিণী, সমব্যথী, সান্ত্বনা প্রদানকারিণী, সহযোগিনী’ *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৮৪৯, ১৯৫২)*।

এখানে আদর্শ নারীর চারটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে- ১. স্বামীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া, ২. ঘন ঘন সন্তান প্রসব করা, ৩। স্বামীর দুঃখ-বেদনায় সমব্যথী হওয়া, ৪। স্বামীর কাজে সহযোগিতা করা।

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالإِبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسْرِ.

রাসূল ﷺ বলেন, ‘তোমরা কুমারীদের বিবাহ করা। কেননা তাদের মুখ বেশি মিষ্টি, তারা অধিক গর্ভধারিণী এবং অল্পতে সন্তুষ্ট’ *(সিলসিলা ছহীহা হা/৬২৩, ১৯৫৭)*। হাদীছে আদর্শনারীর তিনটি গুণ বলা হয়েছে- ১. মিষ্টি মুখ হওয়া অর্থাৎ কোন সময় রাগবশত গরম হয়ে স্বামীর সাথে কথা না বলা। ২. বেশী বেশী সন্তান দেয়া, ৩. অল্পে তুষ্ট হওয়া অর্থাৎ স্বামীর যে কোন জিনিসের প্রতি আপত্তি পেশ না করা।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ–

ছাওবান (রাঃ) বলেন, আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ সবচেয়ে উত্তম, তবে তা সঞ্চয় করতাম। রাসূল ﷺ বললেন, ‘তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে, সবসময় আল্লাহ্কে স্মরণকারী জিহ্বা, শুকরিয়া আদায়কারী অন্তর এবং এমন ঈমানদার স্ত্রী, যে তার স্বামীকে দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য করে’ *(তিরমিযী হা/৩০৯৪, মিশকাত হা/২২৭৭, বাংলা মিশকাত হা/২১৭০)*।

অত্র হাদীছে তিনটি জিনিসকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়েছে।

(১) আল্লাহ্‌র যিকিরকারী জিহ্বা। যার জিহ্বা সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তাসবীহ পাঠ করে ও ক্ষমা চায়। তার জন্য তার জিহ্বা শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
(২) যার অন্তর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া আদায় করে, তার জন্য তার অন্তর শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
(৩) ঐ স্ত্রী শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যে তার স্বামীকে দ্বীনের ব্যাপারে সব ধরনের সাহায্য করতে পারে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'স্ত্রীলোক যখন তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে ও স্বামীর অনুগত থাকে, তখন সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে' *(আবু নু'আইম, মিশকাত হা/৩২৫৪, বাংলা মিশকাত হা/৩১১৫, হাদীছ ছহীহ)।* অত্র হাদীছে আদর্শনারীর চারটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।
(১) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা আদর্শ নারীর একটি বড় গুণ। এগুণ ছাড়া কোন নারী আদর্শ হ'তে পারে না।
(২) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা আদর্শ নারীর দ্বিতীয় বড় গুণ।
(৩) আনুগত্য ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই একজন নারী আদর্শহ'তে পারে। কোন নারী আনুগত্য ছাড়া আদর্শের দাবী করতে পারে না।
(৪) আদর্শহওয়ার জন্য লজ্জাস্থানের হেফাযত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ, যে গুণের মাধ্যমে একজন নারীর ইহকাল ও পরকালের মান-সম্মান নির্ভর করে। একজন ব্যভিচারিণী নারী বিন্দুমাত্র আদর্শের দাবী করতে পারে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'গোটা দুনিয়াটাই হচ্ছে সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে সতীসাধবী নারী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩, বাংলা মিশকাত হা/২৯৪৯)।* অত্র হাদীছে একমাত্র আদর্শস্ত্রীকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়েছে। নবী ﷺ এ কথা বলে নারীদের মান-সম্মান

এত বেশি করেছেন এবং জাতির কাছে তাদেরকে এত মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য করে পেশ করেছেন, যা পৃথিবীর কোন জাতি নারীদের কোন দিন দিতে পারেনি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِيْ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِيْ مَالِكَ وَنَفْسِهَا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম ও আদর্শ নারী হচ্ছে এমন নারী যে, তুমি তার প্রতি দৃষ্টি রাখলে সে তোমাকে খুশী করতে পারে। তুমি আদেশ করলে মান্য করে। তুমি বাড়ীতে না থাকলে সে নিজেকে হিফাযতে রাখে এবং তোমার সম্পদ হিফাযতে রাখে *(বায়হাক্বী, তাফসীর দুররে মানছূর ২/৪৮১ পৃঃ)*।

অত্র হাদীছে আদর্শ নারীর চারটি গুণ পেশ করা করা হয়েছে। যথা- (১) স্বামীর সাথে কথা বললে হাসিমুখে কথা বলে। (২) স্বামী আদেশ করলে মান্য করে। (৩) স্বামী বাড়ীতে না থাকলে নিজেকে হিফাযতে রাখে। (৪) স্বামী অনুপস্থিত থাকলে তার সম্পদ হিফাযত করে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَّسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلُحَ أَنْ يَسْجُدَ بَشَرٌ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ يَّسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرَقِ رَأسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيْدِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মানুষ মানুষকে সিজদা করতে পারে না। মানুষের জন্য মানুষকে সিজদা করা জায়েয হ'লে, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক বড় হওয়ায় আমি স্ত্রীকে আদেশ করতাম স্বামীকে সিজদা করতে। আল্লাহর কসম কারো মাথা হ'তে পা পর্যন্ত যদি জখম হয় এবং সেখান থেকে রক্ত-পূজ বের হ'তে থাকে আর স্ত্রী যদি সে স্থানগুলি জিহ্বা দিয়ে চাটে তবুও সে তার স্বামীর হক্ব আদায় করতে পারবে না *(আহমাদ হা/১৫৫১ হাদীছ ছহীহ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক্ব অনেক বড়। কারণ স্ত্রী সারা জীবন স্বামীর হক্ব আদায় করার চেষ্টা করলেও তা আদায় করা সম্ভব হবে

না। তবুও আদর্শ নারীর কাজ হবে জান্নাত পাওয়ার আশায় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বামীর খিদমতে সর্বদা নিয়োজিত থাকা।

নারী-পুরুষের আদর্শ

মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন তাঁর অগণিত সৃষ্টিকূলের মধ্যে মানব জাতিকে সম্মানিত ও আদর্শকরে সৃষ্টি করেছোন। নারী-পুরুষ উভয়কে যেমন বিশেষভাবে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরষের মধ্যে কিছু বিশেষ গুণাবলীও দিয়েছেন। এই গুণাবলীই তাদেরকে উত্তম, আদর্শও সম্মানিত করতে পারে। তাই বর্তমান বিশ্বের নর-নারীকে উত্তম আদর্শে আদর্শিত হওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ কিছু গুণাবলী সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হ'ল।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের ৩৫-৩৬নং আয়াতে পুরুষ-মহিলাদের আদর্শহওয়ার জন্য ১২টি গুণ উল্লেখ করেছেন। মুসলিম নর-নারী এই গুণগুলি অর্জন করতে পারলে বিশ্বের অন্যান্য জাতির মাঝে তারা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা উঁচু করে সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। কোন শক্তি তাদের পরাস্ত করতে পারবে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশ গঠনে আদর্শনারী-পুরুষের বিশেষ প্রয়োজন। দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য যেসব আদর্শ বা গুণাবলী নারী-পুরুষের অর্জন করা একান্ত আবশ্যক আল্লাহ তা'আলা তা একত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً– وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً﴾

'আল্লাহ্র অনুগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রী লোক, আল্লাহ্র দিকে মনোযোগকারী পুরুষ ও স্ত্রী লোক, সত্য ন্যায়বাদী পুরুষ ও স্ত্রী লোক, সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহ্র নিকট বিনীত-নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক, দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ছিয়াম পালনকারী পুরষ ও স্ত্রীলোক,

লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহ্কে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহ্ এদের জন্য স্বীয় ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। কোন ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্তভাবে ফায়ছালা করেন, তখন সে ব্যাপারে তার বিপরীত কিছু করার কোন অধিকার নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট ভ্রান্ত' *(আল-আহযাব ৩৫-৩৬)*।

অত্র আয়াতে নারী পুরুষের জন্য **১২**টি শিক্ষণীয়, গ্রহণীয় ও অবশ্য পালনীয় আদর্শ রয়েছে। যা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হ'ল।

প্রথম আদর্শঃ মুসলিম হওয়া বা আত্মসমর্পণ করাঃ আত্মসমর্পণ অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আইন পালনে একনিষ্ঠ হওয়া। প্রত্যেক নর-নারীর জন্য মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা নর-নারীর উত্তম বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আর প্রকৃত মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পূর্ণ মুসলিম সে পুরুষ বা নারী যার যবান ও হাত হ'তে অন্যান্য পুরুষ বা নারী নিরাপদে থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬, বাংলা মিশকাত হা/৫)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'মুসলিম সে ব্যক্তি যে নিজের জন্য যা কল্যাণকর মনে অন্যের জন্যও তাই কল্যাণকর মনে করে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫১৭১)*।

দ্বিতীয় আদর্শঃ মুমিন অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপনকারী হওয়াঃ মুমিন অর্থ হচ্ছে ঈমানদার। ইসলামী শরী'আতে মুমিন অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত বিষয় সমূহকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। বাহ্যিকভাবে কতগুলি উত্তম গুণের অধিকারী হওয়া। পূর্ণ মুমিন হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না, যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা ও তার সন্তান এবং অন্যান্য সকল মানুষ থেকে প্রিয়তম না হব' (আমার আদর্শ হবে তার নিকটে সবচেয়ে প্রিয়। আর এটাই ঈমানের পরিচয়) *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭)*।

অন্য এক হাদীছে এসেছে আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে এরূপ উপদেশ খুব কমই দিয়েছেন, যাতে একথাগুলি বলেননি যে, 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই এবং যার অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দ্বীন-ধর্ম নেই' *(আহমাদ হা/১১৯৩৫, মিশকাত হা/৩৫, বাংলা মিশকাত হা/৩১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমানত রক্ষা করা এবং অঙ্গীকার পূরণ করা পূর্ণ মুমিন হওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অন্য এক বর্ণনায় রাসূল(ছাঃ) বলেন, 'একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ' *(সিলসিলা ছহীহ হা/১১১৬)*।

অর্থাৎ একজন অপর জনের গুনাহ বুঝতে পারলে তাকে গুনাহ্ থেকে বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। এটা মুমিন নারী-পুরুষের আর্দশের পরিচয়।

তৃতীয় আদর্শঃ আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশকারী হওয়া। এখানে আল্লাহ তা'আলা এমন নারী-পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের মন ও দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বদা আলাহ্র ইবাদত এবং যিকর-আযকারে মশগূল থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾

'যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের ভয় রাখে ও তার পালনকর্তার রহমতের প্রত্যাশা করে' *(যুমার ৯)*।

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে নারী-পুরুষের একটি মহৎ গুণ উল্লেখ করেছেন। আর তা হচ্ছে রাত জেগে ইবাদত করা, যা নবী-রাসূল ও বড় আবেদগণের আদর্শ। মুলতঃ আদর্শনারী-পুরুষের জন্য ইবাদত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চতুর্থ আদর্শঃ সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া। এর অর্থ সে সব লোক যারা সর্বপ্রকার মিথ্যাকে পরিহার করে এবং সত্যের দিকে এগিয়ে যায়। আর সততা হচ্ছে একটি প্রসংশনীয় আদর্শ এবং এমন ঈমানের পরিচয় যার ফলাফল হচ্ছে জান্নাত। কেননা সত্য মানুষকে পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়। আর পূণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৪)*।

অন্য বর্ণনায় আছে, 'সত্যবাদিতা একটি নেকীর কাজ। আর নেকী জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। আর মিথ্যা হ'ল মহাপাপ। পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৪, বাংলা মিশকাত হা/৪৬১৩)*।

সত্য সম্পর্কে কবির ভাষায় বলতে হয়, 'সত্যের জয়, মিথ্যার ক্ষয়'।

পঞ্চম আদর্শঃ সত্যের পথে দৃঢ়তা অবলম্বনকারী হওয়া। এখানে 'ছবর' অর্থ হচ্ছে নিজেকে বেঁধে রাখা, বিপদাপদ ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ্র দ্বীন পালন ও তাঁর ইবাদত করতে গিয়ে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট অকাতরে সহ্য করে অটল হয়ে থাকা। শত বাঁধা-বিপত্তির সময়ও কোনক্রমেই আদর্শচ্যুত হয় না। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾

(ফেরেশতারা বলবে) 'তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এবং তোমাদের এই পরিণাম গৃহ কতই না চমৎকার' *(রা'দ ২৪)*। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلاً

'অতএব আপনি উত্তম ধৈর্য ধারণ করুন' *(মা'আরিজ ৫)*। মহান রাব্বুল আলামীন অন্যত্র আরো বলেন, وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ

'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর' *(বাক্বারা ৪৫)*।

আয়াতগুলিতে মহান আল্লাহ বিপদের সময়ে ছালাতের মাধ্যমে ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন। যা মুমিন নারী-পুরুষের আদর্শ।

ষষ্ঠ আদর্শ ঃ আল্লাহ্র নিকট বিনীত-নম্র হওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে এমন নারী-পুরুষের আদর্শ বর্ণনা করেছেন, যারা অন্তর-মন ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ সবকিছু দিয়ে বিনীতভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ -الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

'মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা বিনয়ী ও নম্রভাবে ভয়-ভীতি নিয়ে নিজেদের ছালাত আদায় করে' *(মুমিন ১-২)*। বিনয় ও নম্রতা হচ্ছে মুমিন নারী-পুরুষের একটি উত্তম আদর্শ। বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে কবি বলেন, 'বিনয়ে জয়, অহংকারে ক্ষয়'। কবির এই চরণ দ্বারা বুঝা যায় যে, বিনয় ও নম্রতা এক মহৎ গুণ। আর অহংকার বিনীত স্বভাবকে নষ্ট করে। তাই অহংকার সর্বদা পরিত্যাজ্য। ইংরেজী প্রবাদে আছে- When money is lost nothing is lost, when health is lost something is lost but when character is lost everything is lost.

সুতরাং বিনয় ও নম্রতা চরিত্রের এক মহৎ গুণ। এ গুণ বিনষ্ট হ'লে চরিত্র নষ্ট হয়। আর চরিত্র হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সপ্তম আদর্শঃ দানশীল হওয়া। আল্লাহ তা'আলা এখানে এমন নারী-পুরুষের আদর্শ পেশ করেছেন, যারা গরীব-দুঃখী ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, উদ্বৃত্ত মাল কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রদান করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মুমিন ক্বিয়ামতের দিন তার ছাদাক্বার

ছায়াতলে থাকবে’ *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৮১৬)*। নিঃস-অসহায় মানুষকে নেকীর আশায় দান করা মুমিন নর-নারীর আদর্শ।

অষ্টম আদর্শঃ ছিয়াম পালন করা। যেসব নারী-পুরুষ আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী ছিয়াম পালন করবে তাদের তাক্বওয়া বৃদ্ধি পাবে এবং ধৈর্য বেশি হবে। ছিয়াম জান্নাত লাভের মাধ্যম, যার প্রতিদান আল্লাহ্ তা‘আলা নিজ হাতে দিবেন। ইবাদতের মধ্যে ছিয়ামের সমপরিমাণ কোন ইবাদত নেই। তার কোন দৃষ্টান্তও নেই।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একটি ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে করে দিবেন’ *(বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫৩; বাংলা মিশকাত হা/১৯৫০)*।

অন্যত্র রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম হচ্ছে রাইয়্যান। ছিয়াম পালনকারী ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না’ *(বুখারী হা/৩২৫৭; মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৭; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬১)*।

যেসব নারী-পুরুষ অসীম ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তাকে ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দিবেন। আর এটা আদর্শ নারী-পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

নবম আদর্শঃ লজ্জাস্থানের হেফাযত করা। লজ্জাস্থানের হিফাযত করা ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ নারী-পুরুষের একটি বিশেষ গুণ। এসম্পর্কে হাদীছে এসেছে-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমার কাছে এই অঙ্গীকার করবে যে, সে তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর (জিহ্বার) এবং তার দুই পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর (লজ্জাস্থানের) যিম্মাদার হবে, তবে আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব’ *(বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২; বাংলা মিশকাত হা/৪৬০১)*।

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'মানুষের মুখ ও লজ্জাস্থান' *(তিরমিযী হা/২০০৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৬; মিশকাত হা/৪৮৩২; বাংলা মিশকাত হা/৪৬২১; সিলসিলা ছহীহা হা/৯৭৭)*। অত্র হাদীছদ্বয়ে মুখ ও লজ্জাস্থান সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। এই দুই অঙ্গ দ্বারাই মানুষ বেশি বেশি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। আর যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় না, তাদের জন্য জান্নাতে প্রবেশে কোন বাধা নেই। কেবলমাত্র আদর্শ নারী-পুরুষই এই গুণের অধিকারী হ'তে পারে।

দশম আদর্শঃ আল্লাহ্‌কে অধিক মাত্রায় স্মরণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

'আর আপনি আপনার প্রতি পালককে বেশি বেশি স্মরণ করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করুন' *(আলে ইমরান ৪১)*।

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ কর' *(আহযাব ৪১)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ সবসময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন *(সিলসিলা ছহীহা হা/৪০৬)*।

অত্র আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সবসময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকা উচিত নয়। সর্বদ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা আদর্শ নারী-পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

একাদশ আদর্শঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়ছালাকে চূড়ান্তভাবে মেনে নেওয়া। অর্থাৎ কোন ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ যখন কোন বিষয়ে ফায়ছালা করে দেন, তখন সে ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করার কোন অধিকার মুমিন নর-নারীর থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

'অতঃপর আপনার পালনকর্তার কসম! সে লোক ঈমানদার হ'তে পারে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সংঘটিত বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মেনে না নিবে এবং আপনার মীমাংসার ব্যাপারে তাদের মনে কোন সংকীর্ণতা থাকবে না ও তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিবে' *(নেসা ৬৫)*।

অত্র আয়াতে তিনটি বিষয়কে স্পষ্টভাবে পেশ করা হয়েছে। যথা-

প্রথমতঃ মুসলিম নারী-পুরুষ রাসূল (ছাঃ)-এর যাবতীয় মীমাংসায় সন্তুষ্ট থাকবে, আর যারা এমন নয় তারা থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ পরিহার করে, উভয় পক্ষকে রাসূল(ছাঃ)-এর কাছে এবং তাঁর অবর্তমানে কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছের আশ্রয় নিয়ে মীমাংসার পথ অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর প্রতি ফরয।

তৃতীয়তঃ যে বিষয়টি নবী (ছাঃ)-এর কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও আদর্শহীন নারী-পুরুষের লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَوْ أَنَّ مُوسَى ﷺ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِي

'মূসা (আঃ) যদি বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকত না' *(আহমাদ হা/১৪৬২৩; মিশকাত হা/১৯৪, হাদীছ ছহীহ)*।

উক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী (ছাঃ)-এর শরী'আত ব্যতীত অন্য কোন শরী'আত আদৌ মানা যাবে না। আর ইমাম, পীর, ওয়ালী-আওলিয়াতো দূরের কথা। আদর্শনারী-পুরুষের দ্বারা এমন কাজ কখনো হ'তে পারে না।

দ্বাদশ আদর্শঃ যে নারী-পুরুষ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে, সে স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত। এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম নারী-পুরুষকে তাঁর নাফরমানী না করার ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। কারণ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ মানবে না, তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর আল্লাহ্র সাথে শিরক করা সবচেয়ে বড় নাফরমানী, যার পরিণাম ভয়াবহ *(মায়েদা ৭২)*।

কন্যারূপে নারী

ইসলামের প্রাককালে আরবদের নিকট কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়া পিতার জন্য অপমানজনক ছিল। পিতার নিকট কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ দেওয়া হ'লে তারা ভাবত কিভাবে এ জঘণ্য অপমান থেকে বাঁচা যায়। তাই তারা কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করত। মহান আল্লাহ কন্যা সন্তানের প্রোথিতকরণ সম্পর্কে বলেন,

وَ إِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

'জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল' *(তাকবীর ৭-৮)*।

জাহেলী যুগে কন্যা সন্তান ছিল পিতা ও সমাজের নিকট এক অপদার্থ ও মূল্যহীন। তাকে সমাজে বেঁচে থাকতে হ'লে লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে বেঁচে থাকতে হ'ত। সমাজে তাদের কোন মূল্য ছিল না। এমনকি পিতার সম্পদে তাদের কোন অংশও ছিল না। কিন্তু ইসলাম মানবতার জন্য এই চরম অবমাননাকর রীতি চিরতরে বিলুপ্ত করেছে। কুরআন মাজীদে কন্যাদেরকে পুরুষের মতই মীরাছের অংশীদার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ–

'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের বিশেষ অর্থনৈতিক বিধান দিচ্ছেন। তিনি আদেশ করছেন একজন পুরুষ দু'জন মেয়ের সমান অংশ পাবে। কেবল মেয়ে সন্তান দু'জন কিংবা ততোধিক হ'লে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি একজন কন্যা হয় তাহ'লে সে মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে' *(নিসা ১১)*।

কন্যা লালন-পালন জান্নাত পাওয়ার মাধ্যম

প্রাক ইসলামী যুগে কন্যা সন্তান যেমনভাবে অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, অপদস্ত ও অবমূল্যায়িত হ'ত, ইসলাম কন্যা সন্তানকে তার যথাযোগ্য সম্মান-মর্যাদা দিয়ে মুসলিম সমাজে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। মহানবী মুহাম্মাদ

(ছাঃ) কন্যা সন্তান লালন-পালনের প্রতিও মানুষকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। এ মর্মে অনেক হাদীছ এসেছে, তার কয়েকটি এখানে উল্লেখিত হ'ল-

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ .

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক মহিলা তার দুইটি কন্যা সাথে নিয়ে আমার কাছে আসল। মহিলাটি আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল। তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি তাই তাকে দিয়ে দিলাম। সে তা দুই ভাগ করে তার দুই কন্যাকে দিলো এবং নিজে তা থেকে কিছু খেল না। তারপর সে উঠে চলে গেলো। এমন সময় নবী ﷺ বাড়িতে প্রবেশ করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁর কাছে পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি কন্যাদের ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে, তাহ'লে এই কন্যাগণ তার জন্য জাহান্নামের অন্তরাল হবে' *(বুখারী হা/৫৯৯৫; মুসলিম, মিশকাত হাঃ/৪৯৪৯)*।

অর্থাৎ সে জান্নাতে যাবে। ছেলেদের তুলনায় মেয়ে সন্তান অনেক বেশি অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। সর্বকালে নারীরা ছিল সমাজে অবহেলিত, অপদস্ত। বিশেষত জাহেলী যুগে। তাই নবী ﷺ সেই ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করেছেন। নারীদের সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তাদের দায়িত্ব যারা যথাযথভাবে পালন করবে তাদের জন্য রাসূল ﷺ জান্নাত লাভের ঘোষণা দিয়েছেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

আনাস (রা) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে বিবাহ-শাদী দেওয়া পর্যন্ত লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করবে, আমি এবং সেই ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন এভাবে একত্রে থাকব। এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুলগুলি মিলিয়ে ধরলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩, বাংলা মিশকাত হা/৪৭৩৩ 'সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ' অধ্যায়)*।

স্ত্রী হিসাবে নারী

ইসলামপূর্ব সমাজে নারীরা স্ত্রী হিসাবেও কোন মর্যাদা পেত না। চরম অপমান ও অমর্যাদা তাদেরকে সহ্য করতে হ'ত। স্বামীর নিকটেও তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। তাদের সাথে দাসী-বাদীর মত জঘন্য আচরণ করা হ'ত। ইসলাম স্ত্রী হিসাবে নারীদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। সমাজে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য নারীকে পুরুষের সমান বলে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে, যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের উপর' *(বাক্বারা ২২৮)*।

নারী-পুরুষ উভয়ে আল্লাহর নিকট সমান। মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জাহেলী সমাজে স্ত্রীদের উপর নানা রকম যুলুম-নির্যাতন চালানো হ'ত। একদিকে স্বামীদের নিকট তাদের কোন মর্যাদা ছিল না, অন্যদিকে এক স্বামীর নিকট থেকে তালাক নিয়ে অন্য স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ও সুযোগও তাদের দেওয়া হ'ত না। বরং আটকে রেখে তাদের উপর নানাভাবে যুলুম-অত্যাচার চালিয়ে তাদের নিকট থেকে নিজেদের দেওয়া ধন-সম্পদ ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাত। আর এজন্য তারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করত, যা ছিল অমানবিক। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ করে বলেন,

وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ-

'তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) দেয়া ধন-সম্মপদের কিছু অংশ কেড়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রাখবে না' *(নিসা ১৯)*।

প্রাক ইসলামী যুগে স্ত্রীরা অস্থাবর সম্পত্তি বলে বিবেচিত হ'ত। কোন লোক মারা গেলে তার ধন-সম্পদ যেমনভাবে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত, তেমনিভাবে তার রেখে যাওয়া স্ত্রীদেরকেও বন্টন করা হ'ত। এ প্রথা ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মধ্যেও চালু ছিল। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ মুসলমানদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করেন

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا–

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা মহিলাদেরকে অন্যায়ভাবে জবরদস্তি করে নিজেদের মীরাছের সম্পত্তি বানিয়ে নিও না। তা তোমাদের পক্ষে কখনো হালাল হবে না’ *(নিসা ১৯)*।

নবী করীম (ছাঃ)ও তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেন,

فَاتَّقُوْا اللهَ فِيْ النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَّ يُوْطِيْنَ فِرَشِكُمْ أَحَدٌ تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ-

‘তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ আল্লাহর যামানতে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাদের গুপ্তাঙ্গকে হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের হক্ব হ’ল তারা যেন তোমাদের মহ’লে অপর কাউকে যেতে না দেয়, যা তোমরা অপসন্দ কর। যদি তারা তা করে তবে তাদেরকে প্রহার করবে, তবে সে প্রহার যেন কঠোর না হয়। আর তোমাদের উপর তাদের হক্ব হ’ল তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে’ *(বাংলা মিশকাত হা/২৪৪০)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা কোন সময় কোন অপরাধ করে তবে তাদেরকে লঘু শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু অমানবিকভাবে বেদম প্রহার করা যাবে না। তাদের জন্য সাধ্যমত অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের সাথে অমানুষিক ব্যবহার করা যাবে না।

জাহেলী যুগে স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের নিকটে ছিল কেবল ভোগের সামগ্রী। স্বামীর কাছে তাদের কোন মূল্য ছিল না। স্বামীর কাছে তারা তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা যেমন পেত না, তেমনি তাদের পক্ষ থেকে কোন ভালবাসাও পেত না। যথেচ্ছা তাদের উপর নির্যাতন করত। রাসূল (ছাঃ) তাদের এই মানসিকতাকে উচ্ছেদ কল্পে ঘোষণা করেন, ‘আমার নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হচ্ছে স্ত্রী ও সুগন্ধি’ *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫২৬১)*।

মা হিসাবে নারী

জাহেলী যুগে নারী সমাজের মান-মর্যাদা এতই নিম্নে নেমে গিয়েছিল যে তাদেরকে পণ্যের মত ব্যবহার করা হ'ত। তাদের কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না। তাদের মতামতের কোন গুরুত্ব দেয়া হ'ত না। এমনকি ছেলেরা পিতার মৃত্যুর পরে তার স্ত্রী তথা সৎ মাতাকে বিনাদ্বিধায় স্ত্রীরূপে ব্যবহার করত। বলা বাহুল্য, যাকে মা বলে সম্বোধন করা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা মানব চরিত্রের জঘন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। জাহেলী যুগের এই জঘন্য প্রথার মূলোৎপাটন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ–

'যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না' *(নিসা ২২)*। পিতা-মাতার মান-সম্মান ও যথাযথ মর্যাদা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا–

'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করো না। আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদয় ব্যবহার কর' *(নিসা ৩৬)*।

মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পর পরই পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহারের কথা বলেছেন। ইসলাম পূর্ব যুগে মায়ের যেমন কোন মান-সম্মান, মর্যাদা ছিল না, ইসলামের আগমনের পর আল্লাহ মায়ের স্থান অনেক ঊর্ধ্ব করে দিয়েছেন। ইসলামী সমাজে মা অতি শ্রদ্ধার পাত্র। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মায়ের অত্যন্ত মর্যাদা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য।

আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) এর নিকট আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী কে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১১, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৯৪)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের কাছে পিতা অপেক্ষা মায়ের অধিকার ও মর্যাদা অনেক বেশী। ইসলামে মা হিসাবে নারীকে যে উঁচু মার্যাদা ও

সম্মান দেওয়া হয়েছে, দুনিয়ার অপর কোন মানুষের সম্মানের সাথে তার কোন তুলনা হয় না।

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, আছেন। তিনি বললেন, যাও মায়ের খিদমতে নিজেকে নিয়োগ কর। কেননা জান্নাত তার পায়ের নিচে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৩৯, বাংলা মিশকাত হা/৪৭২২)*।

অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতার চেয়ে মায়ের অধিকার অনেক বেশী। এর তিনটি কারণ রয়েছে- প্রথমতঃ সুদীর্ঘ দশমাস যাবৎ মা তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে অপরিসীম কষ্ট করে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ প্রসবকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সন্তান প্রসব করেন। তৃতীয়তঃ দুগ্ধপান থেকে শুরু করে প্রায় দশ বছর বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত মা নিজের আরামকে হারাম করে সন্তানের লালন-পালন ও সেবা-যত্ন তৎপর থাকে। যা অন্য কোন কিছুর সাথে তুলনীয় নয়। তাই মাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলে, তার উপযুক্ত খিদমত করলে এবং তার হক্ব সঠিকভাবে আদায় করলে সন্তান বেহেশত লাভ করতে পারে। এক কথায় মায়ের খিদমতের উপর নির্ভর করে সন্তানের জান্নাত। মায়ের সম্মান না করে, তার খিদমত না করে, তাকে কষ্ট দিয়ে, তার সাথে খারাপ ব্যবহার ও খারাপ আচরণ করে যে যত ইবাদত-বন্দেগী, দান-খয়রাত করুক না কেন সেসব কোন কাজে আসবে না। তাই আমাদের সকলকে মায়ের সাথে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে সদা সচেতন হওয়া যরূরী। আর এটাই আদর্শ নারী-পুরুষের কাজ।

নারীরা যেহেতু মায়ের পাশে থাকতে পারে না; বরং তাকে স্বামীর বাড়ীতে কাটাতে হয় সেহেতু তাদেরকে মায়ের স্থলে শ্বাশুড়ীকে মায়ের মত যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া উচিত। কেননা শ্বাশুড়ীর আদেশে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে *(মিশকাত হা/৪৯২৮)*। মূলতঃ শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সঙ্গে সাদাচরণ করা একমাত্র আদর্শ নারীর পক্ষে সম্ভব।

আদর্শ নারীর আদব বা শিষ্টাচার

الاداب বহুবচন, একবচনে الادب। আভিধানিক অর্থে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বুদ্ধিমত্তা ও শালীনতার সাথে কথা বলা বা কাজ করা, প্রতিটি কাজকে বুঝে-শুনে বিচক্ষণতার সাথে আনজাম দেওয়াই হচ্ছে আদব। আর পারিভাষিক অর্থে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা। কথায় ও কাজে এমন আচরণ প্রকাশ করা যা দ্বারা

প্রশংসা লাভ করা যায়। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়াকে আদব বলে। প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর জন্য উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া একান্ত যরূরী। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عن أبي هريرة رضـ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ الْجَنَّةَ قَـالَ تَقْـوَى اللهِ وَ حُسْنُ الْخُلْقِ وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ النَّارَ فَقَالَ الْفَهْمُ وَالْفَرْجُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন জিনিস মানুষকে অধিক জান্নাতে প্রবেশ করায় তিনি বলেন তাক্বওয়া ও সচ্চরিত্র। তাকে আরো জিজ্ঞেস করা হ'ল কোন জিনিস মানুষকে অধিক জাহান্নামে প্রবেশ করায়। তিনি বলেন, মুখ ও লজ্জাস্থান *(তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীছটি হাসান ও ছহীহ, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬২৭; মিশকাত হা/৪৮৩২)।*

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও পরহেযগারিতার সঙ্গে সঙ্গে সচ্চরিত্রও জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। আর মুখ ও লজ্জাস্থান জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। মূলতঃ চরিত্র মানব জীবনের ভূষণ। তাই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হ'তে হ'লে বিনয়ী ও নম্র হ'তে হবে। সেজন্য পরিত্যাগ করতে হবে অহংকার দাম্ভিকতা, মিথ্যা, পাপাচার গাল-মন্দ অশ্লিল ভাষা। ব্যভিচার, গীবত-তোহমত। যে এসব অহেতুক আচরণ হ'তে মুক্ত সেই হচ্ছে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য আরো কতিপয় বিষয় হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর তোমরা ঈমানদার হ'তে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দিব না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? (অবশ্যই বলব তাহ'ল) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১; বাংলা মিশকাত হা/৪৪২৬)।*

অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল ইসলামে কোন কাজ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম করা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৯; বাংলা মিশকাত হা/৪৪২৪)।* অত্র হাদীছ দু'টিতে চারটি উত্তম আদর্শের কথা বলা বলা হয়েছে- (১) জান্নাতে প্রবেশের জন্য পূর্ণ ঈমানের প্রয়োজন (২) পরস্পরকে ভালবাসা (৩) সালামের

প্রচলন করা, চেনা-অচেনা সকলকে সালাম করা (৪) ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়ানো। উক্ত কাজগুলির প্রতি প্রত্যেককেই সজাগ হ'তে হবে। তবে মহিলাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র। কেননা যেখানে ক্ষতি ও মন্দ কল্পনার আশংকা রয়েছে, সেখানে সালাম দেওয়া ঠিক নয়। এমন বৃদ্ধ যার মধ্যে ক্ষতির কোন আশংকা নেই, তাকে সালাম দেওয়াতে কোন দোষ নেই।

রাসূল (ছাঃ) সালামের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যে, কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যককে সালাম করবে। ছোটরা বড়দেরকে সালাম দিবে, আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচলকারীকে এবং পদব্রজে চলাচলকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম করবে। এতে কারো অন্তরে কোন অহংকার বা বিদ্বেষ থাকে না। সালামের জন্য নির্ধারিত বাক্য হচ্ছে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। জবাবে ওয়া আলাইকুমস সালাম বললে ১০ নেকী পাবে। তার সাথে ওয়া রহমাতুল্লাহ যোগ করলে ২০ নেকী, ওয়া বারাকাতুহ যোগ করলে ৩০ নেকী পাবে এবং ওয়া মাগফিরাতুহু যোগ করলে ৪০ নেকী পাবে। ছওয়াবের পরিমাণ এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে *(আবুদাউদ, বাংলা মিশকাত হা/৪৪৪০)*।

সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় যে প্রথমে সালাম করে *(বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৪৪৪১)*। কারো বাড়ির দরজায় অনুমতির জন্য কমপক্ষে তিন বার সালাম করবে অনুমতি না পেলে ফিরে যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৬৭)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) (আমাকে লক্ষ্য করে) বললেন, হে বৎস! যখন তুমি পরিজনদের নিকট প্রবেশ কর তখন তুমি সালাম করবে, এতে তোমার ও গৃহবাসীর জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে *(তিরমিযী, বাংলা মিশকাত হা/৪৪৪৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে বাড়ীতে প্রবেশের আগেই সালাম দিতে হবে। নিজ বাড়ী হোক বা অন্যের বাড়ী হোক প্রবেশদ্বারে সালাম দেওয়া সুন্নাত। যদি কেউ কারো মাধ্যমে সালাম পাঠায় তাহ'লে তার জবাব দাতা বলবে 'আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম'। অর্থ আপনার ও অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। প্রকাশথাকে যে, জাহেলী যুগে সালামের প্রচলন ছিল না। সে যুগে আনইম ছবাহান বা Good Morning বলা হ'ত। ইসলাম আসার পরে উক্ত প্রথা নিষিদ্ধ করে সালামের প্রচলন হয়। রাসূল (ছাঃ) মুসলিম অমুসলিম মিলিত মজলিসে এবং মহিলা ও শিশুকে সালাম দিতেন। আর অমুসলিমরা সালাম দিলে উত্তরে বলবে, 'ওয় আলইকুম'। সালামের সঙ্গে স্পৃক্ত মুছাফাহ অর্থ হাতের তালুর সঙ্গে তালু মিলান। মুছাফার সময় একে অপরের ডান হাতের তালুর সাথে মিলাতে হয়। ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে মুছাফাহ করতেন *(বুখারী, মিশকাত*

হা/৪৬৬৭)। উল্লেখ্য, সালামের সময় يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ বর্ণিত দো‘আটি ভিত্তিহীন। আর نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ বর্ণিত দো‘আটি যঈফ। সালামই মূলতঃ দো‘আ আর কোন দো‘আ বলার প্রয়োজন নেই।

চলাফেরা, শোয়া ও নিদ্রার আদবঃ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটা কোন পুথিগত বিদ্যা বা নীতিবাক্য সম্বলিত কাব্য নয়। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবন চরিত ও আদর্শের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত। ফলে মানবজীবনে কোন কাজই তাঁর আদর্শের বাইরে নয়। তাই চলা-ফেরা, উঠা-বসা, শোয়-নিদ্রা এমনকি যাবতীয় কর্মকাণ্ড কিভাবে সমাধা করতে হবে তা তিনি তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর চলা-ফেরার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَمْشِ فِيْ الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً–

‘তুমি পৃথিবীতে অহংকার করে চল না। নিশ্চয়ই তুমি যমীনকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারবে না *(ইসরা ৩৭)*।

অন্য আয়াতে আছে ইবলীস তার অহংকারের কারণে কাফের হ’ল। তাই অহংকার ও দাম্ভিকতা পরিহার করা যরূরী। আমর ইবনে শারীদ (রাঃ) তার পিতা হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমার নিকট দিয়ে গমন করলেন। তখন আমি এমন অবস্থায় বসা ছিলাম যে, আমার বাম হাত ছিল আমার পিঠের পিছনে আর ডান হাতের তালুর উপর ভর করে বসেছিলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি এমনভাবে বসে আছ যেভাবে আল্লাহর অভিশপ্ত লোকেরা বসে *(আবুদাউদ, বাংলা মিশকাত হা/৪৫২৪)*। এভাবে বসা দুই কারণে নিষেধ- ১. অহংকারীরা এমন করে বসে ২. এরূপ বসা ইহুদীদের বসার ন্যায়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে কা‘বা শরীফের আঙ্গিনায় এরূপ স্বীয় উভয় হাত দ্বারা ‘ইহতেবা’ অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছি *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭০৭; বাংলা মিশকাত হা/৪৫০২)*। ইহ’তেবা করে বসা অর্থ দুই হাটুকে খাড়া করে হাত বা কাপড় দ্বারা উভয় উরুকে জড়িয়ে বসা। এভাবে বসা জায়েয তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সতর খুলে না যায়।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, রাসূল (ছাঃ) কুরফুছা অর্থাৎ দুই হাটুকে মাটির সাথে বিছিয়ে দুই হাতের তালুকে উভয় বগলের নিচে চাপিয়ে বসা। *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৭১৪; বাংলা মিশকাত হা/৪৫০৯)*। অন্য বর্ণনায় আছে যে, রাসূল (ছাঃ) আসন পেতে বসতেন। এভাবে বসে তিনি যিকির-আযকার করতেন' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/ ৪৭১৫; বাংলা মিশকাত হা/৪৫১০)*।

বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন শয্যায় যেতেন তখন ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করতেন। অতঃপর বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ إِلَيْكَ وَ فَوَضَّتُ اَمْرِىْ إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِىْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَّ رَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَ لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَ بِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ-

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা আস্‌লামতু নাফ্‌সী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হী ইলাইকা ওয়া ফাওওয়ায্বতু আমরী ইলায়কা ওয়া লজা'তু য:হরী ইলাইকা রগ্‌বাতাঁ ওয়া রহ্‌বাতান ইলাইকা লা-মাল্‌জা ওয়া লা-মাংজা মিংকা ইল্লা- ইলাইকা আ-মাংতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আংঝালতা ওয়া বিনাবিইয়িকাল্লাযী আর্‌সালতা।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। আমি তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার কাজ তোমার নিকট ন্যস্ত করলাম, আগ্রহে ও ভয়ে তোমার সাহায্যের প্রতি ভরসা করলাম। একমাত্র তোমার নিকট ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই। আমি তোমার অবতীর্ণ কিতাবকে বিশ্বাস করি। আর ঐ নবীকে বিশ্বাস করি, যাকে তুমি নবী হিসাবে পাঠিয়েছ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এ দো'আ পাঠ করে তারপর রাতে মৃত্যুবরণ করে, সে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৫)*।

হুযাইফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন গালের নিচে হাত রাখতেন তারপর বলতেন, 'আল্লাহুম্মা বি ইসমিকা আমূতু ওয় আহইয়া'। অতঃপর যখন জাগ্রত হ'তেন তখন বলতেন, 'আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৮২)*।

عن أبي ذر رضـ قَالَ مَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي فَرَكَضَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ يَا جُنْدُبُ اِنَّمَا هِيَ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ–

আবুযর (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমি উপুড় হয়ে শোয়া ছিলাম। তিনি স্বীয় পা দ্বারা আমাকে নাড়া দিয়ে বললেন, হে জুনদুব! এইরূপ শোয়া দোযখীদের অভ্যাস *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৭৩১; বংলা মিশকাত হা/৪৫২৫)*। (আবুযর-এর নাম জুনদুব ইবনে জুনাদাহ আল-গিফারী)। অন্য বর্ণনায় আছে আল্লাহ উপুড় হয়ে শোয়াকে পসন্দ করেন না *(তিরমিযী, মিশকাত হা/ ৪৭১৮; বাংলা মিশকাত হা/ ৪৫১৩)*। এজন্য উপুড় হয়ে শোয়া ঠিক নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতেও এটা খারাপ, এতে জাহান্নামীদের শয়নের সাদৃশ্য হয়। এটা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) পসন্দ করেন না। উপরোল্লিখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, ডান কাতে শোয়া সুন্নাত এবং উপুড় হয়ে শোয়া নিষেধ। উল্লেখ্য যে, বাম কাতে এবং চিত হয়ে শোয়া জায়েয। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন রাতে শয্যায় যেতেন তখন তার দু'হাত একত্রিত করে হাতে ফুঁক দিতেন এবং সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়তেন। অতঃপর দু'হাত দ্বারা সম্ভবপর সমস্ত শরীর মুছে দিতেন। মাথা, মুখ ও শরীরের সম্মুখ ভাগ মুছতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২)*।

হাঁচি ও হাই-এর আদবঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন সে যেন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে এবং তার কোন মুসলমান ভাই অথবা সঙ্গী যে উহা শুনবে, সে যেন বলে 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' বলে। আর যখন সে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে তখন হাঁচিদাতা যেন বলে, 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম' *(বুখারী, মিশকাত হা/ ৪৭৩৩; বাংলা মিশকাত হা/৪৫২৭)*।

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তখন তোমরা তার জবাব দিবে। আর যদি সে 'আলহামদুলিল্লাহ' না বলে তবে তোমরাও তার জবাব দিবে না *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৪৫২৯)*।

অত্র হাদীছগুলি প্রমাণ করে যে, কারো যদি হাঁচি আসে, তাহ'লে তাকে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে হবে। আর যদি কোন মুসলমান তা শুনে তাহ'লে তার জন্য ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা যরূরী এবং হাঁচিদাতার জন্য ও 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ' বলা আবশ্যক। আর যদি হাঁচিদাতা কিছু না বলে, তাহ'লে তার জন্যও কিছু বলতে হবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩৫)*। অতএব আমাদের জন্য করণীয় রাসূলের সুন্নাতকে অনুসরণ করা।

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم اِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারো হাই আসে তখন সে যেন স্বীয় হাত দ্বারা নিজের মুখ বন্ধ করে রাখে। কেননা শয়তান মুখের ভিতর প্রবেশ করে' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৪৫৩১)*। হাঁচির সময় 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এর কারণ হচ্ছে হাঁচি আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। হাঁচি আল্লাহর নিয়ামত। বস্তুতঃ হাঁচি দ্বারা মস্তিষ্কের জড়তা কেটে যায় এবং শারীরিক-মানসিক প্রফুল্লতা অনুভূত হয়। তাই এর কারণে আল্লাহর প্রশংসা করার কথা বলা হয়েছে। আর হাই নিদ্রা ও অলসতার প্রভাব। এটা আল্লাহর ইবাদতে অমনোযোগী করে দেয়, যা আল্লাহর অপছন্দ। তাই হাইতে মুখ বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। হাঁচির সময় মুখে কাপড় অথবা হাত দ্বারা ঢেকে ফেলা এবং হাঁচির শব্দকে নিচু রাখা উত্তম *(তিরমিযী, বাংলা মিশকাত হা/ ৪৫৩২)*।

খাওয়ার আদবঃ

عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ-

ওমর ইবনে আবু সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হ'তে খানা খাও এবং তোমার নিকটের খাবার খাও' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/ ৩৯৮০)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ আহার করে, তখন সে যেন বলে بسم الله *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/ ৩১৫৯)*। আর প্রথমে যদি আল্লাহর নাম স্মরণ করতে ভুলে যায়, তাহ'লে বলবে بسم الله اوله واخره 'বিসমিল্লাহি আও-ওয়ালাহু ওয় আখিরাহু' *(তিরমিযী, ২য় খন্ড ৭পৃঃ সনদ ছহীহ আলবানী)*।

উপরোক্ত হাদীছগুলিতে খাওয়ার কয়েকটি আদবের কথা বলা হয়েছে- ক. খাওয়ার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলা। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী যে খাদ্যে 'বিসমিল্লাহ' বলা হয় না, সে খাদ্যে শয়তান অংশগ্রহণ করে *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৮১)*। খ. ডান হাতে খাওয়া এবং পান করা। রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী তোমরা ডান হ'তে খাও এবং পান কর *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৮৩)*। কেউই যেন বাম হ'তে না খায় এবং পান না করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে। তাই যারা বাম হাতে খায়, তারা শয়তানের অনুসরণ করে। গ. নিজের নিকট হ'তে এবং এক পাশ হ'তে খাদ্য খাওয়া সুন্নাত। কারণ মাঝখানে বরকত নাযিল হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পাশ থেকে খাও। মাঝখান থেকে খেয়ো না। কারণ মাঝখানে বরকত নাযিল হয়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪২১১)*। ঘ. প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে খাওয়ার মধ্যে যখনই স্মরণ হবে তখনই 'বিসমিল্লাহি আও-ওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু' বলা।

প্রত্যেক আদর্শ নারীর জন্য যরূরী যে, রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খাওয়া এবং সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে সুন্নাত মোতাবেক খাদ্য গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহিত করা। কেননা রাসূল (ছাঃ) তার খাদেম ওমর ইবনে আবু সালমাকে খাদ্য গ্রহণের নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন। খাদ্যের বাসন এবং আঙ্গুল চেটে খাওয়া সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, 'তোমাদের প্রতিটি কাজের সময় শয়তান তার পাশে উপস্থিত হয় এমনকি আহারের সময়ও। সুতরাং যদি তোমাদের কারো লোকমা পড়ে যায় সে যেন তা তুলে ময়লা পরিষ্কার করে খায় এবং শয়তানের জন্য ছেড়ে না দেয়, আর খাওয়ার শেষে যেন

আঙ্গুল চেটে খায়। কেননা সে জানে না যে খাদ্যের কোন অংশে বরকত আছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/ ৪১৬৭; বাংলা মিশকাত হা/ ৩৯৮৮)*।

উক্ত হাদীছটিতে দু'টি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে- ১.খাওয়ার সময় খাদ্যের কিছু অংশ পড়ে গেলে তা তুলে খাওয়া আবশ্যক। যদি তাতে ময়লা লেগে যায় তবুও তা পরিষ্কার করে খেতে হবে। ২.খাওয়ার শেষে হাত ধোয়ার পূর্বে উত্তম রূপে আঙ্গুল এবং খাদ্যের বাসন চেটে খাওয়া। কারণ খাদ্যের কোন অংশে বরকত আছে তা আমাদের জানা নেই। খাদ্য গ্রহণের সময় হেলান দিয়ে খাওয়া ঠিক নয়। দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা ঠিক নয়।

عن جحيفة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاَ اَكُلُ مُتَّكِيًا–

আবু জোহাইফা হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি হেলান দিয়ে খাই না, হেলান দিয়ে খাওয়া অহংকারীদের আচরণ। তাই নবী করীম (ছাঃ) এটা পসন্দ করতেন না *(বুখারী, মিশকাত হা/ ৪১৬৮; বাংলা মিশকাত হা/ ৩৯৮৯)*। হেলান দিয়ে খাওয়া রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত পরিপন্থী।

عن أبي هريرة رضـ قَالَ مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ اِنِ اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) কখনও কোন খাদ্যের দোষ প্রকাশ করেননি। অবশ্য মনে চাইলে খেতেন এবং অপসন্দ হ'লে পরিত্যাগ করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ বাংলা মিশকাত হা/ ৩৯৯৩)*।

ইমাম নববী বলেন, খাদ্যের শিষ্টাচারিতা হ'ল তার কোন দোষ বর্ণনা না করা। অবশ্য হারাম বস্তু খাদ্য নয়। কাজেই তার দোষ ও অপকারিতা বর্ণনা করা যায়।

খাদ্য পরিমাণে কম খাওয়াঃ

মহান আল্লাহর বাণী- كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

'তোমরা খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যায়ীদেরকে পসন্দ করেন না' *(আরাফ ৩১)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে

খেতে ও পান করতে বলেছেন। কিন্তু খাওয়ার মধ্যে অপব্যয় করতে নিষেধ করেছেন। কেননা অপব্যয়কারীদেরকে তিনি পসন্দ করেন না।

খাদ্য কম খাওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীছ রয়েছে। মিকদাদ ইবনে মা'দীকারাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি তার উদর অপেক্ষা মন্দ কোন পাত্রকে পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য এই পরিমাণ কয়েক লোকমাই যথেষ্ট যা দ্বারা সে নিজের কোমরকে সোজা রাখতে পারে ও আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। আর যদি এর অধিক খাওয়ার প্রয়োজন মনে করে, তবে এক তৃতীয়াংশ খাদ্য, আরেক তৃতীয়াংশ পানীয় এবং অপর তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ. মিশকাত হা/৫১৯২; বাংলা মিশকাত হা/৪৯৬৫)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ যখন খাদ্য গ্রহণ করে তখন তার পেটকে তিন ভাগে ভাগ করে একভাগ খাদ্য, এক ভাগ পানীয় এবং আর এক ভাগ খালি রাখা উচিৎ। কেননা আদম সন্তান যা দ্বারা তার পেট ভর্তি করে তাই হচ্ছে মন্দ বস্তু। যখন সে তার পেট পূরণ করে আহার করবে তখন তার পেটের হজম শক্তির গরমিল দেখা দিবে, তখন শরীরে বিভিন্ন রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হবে তাতে শরীরের অনেক ক্ষতি হবে। বর্তমান অভিজ্ঞ চিকিৎসকদেরও একই অভিমত যে পেটের এক তৃতীয়াংশ খালি রাখা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। আর দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৯৬)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, যে খাদ্যে একজনে পরিতৃপ্ত হয়, সেই খাদ্য দু'জনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট। এমনিভাবে দু'জনের খাদ্য চারজনের জন্য এবং চারজনের খাদ্য আটজনের জন্য যথেষ্ট। কেননা অর্ধ পেট খেলে মানুষ মরে যায় না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল যে, নিজে কিছু কম খেয়ে কোন ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানোর প্রতি উৎসাহিত করা। কেউ উদর পূরণ করে খাবে আর কেউ না খেয়ে থাকবে এটা ঠিক নয়। ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন বেশি ক্ষুধার্ত হবে যে দুনিয়াতে বেশি পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়েছে' *(শরহে সুন্নাহ, মিশকাত হা/৫১৯৩; বাংলা*

মিশকাত হা/ ৪৯৬৬)। দুনিয়াতে একটু ক্ষুধার্ত থেকে পরকালে ক্ষুধার্ত না থাক্ই শ্রেয়। কেননা দুনিয়ার ক্ষুধা-তুষ্ণা ক্ষণিকের জন্য আর পরকালের ক্ষুধা-তৃষ্ণা স্থায়ী।

উল্লেখ্য যে, নিজের শরীরকে হালকা-পাতলা রাখার জন্য কম খাওয়া ঠিক নয়। কেননা তাতে তার শরীর দুর্বল হয়ে যেতে পারে, এতে তার কর্ম-জীবন এবং আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে অলসতা দেখা দিতে পারে। তাই পেটের এক তৃতীয়াংশ খালি রেখে খাওয়া উচিত।

খাওয়ার শেষে করণীয়ঃ

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট, যে একগ্রাস খাদ্য খেয়ে তাঁর প্রশংসা করে অথবা এক ঢোক পানি পান করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করে' *(মুসিলম বাংলা মিশকাত হা/ ৪০১৮)*। আবু উমামাহ হ'তে বর্ণিত, যখন রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখ হ'তে দস্তরখানা উঠানো হ'ত তখন তিনি এ দো'আ পড়তেন,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَ لاَ مُوَدَّعٍ وَ لاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا–

উচ্চারণঃ আলহ:াম্দু লিল্লা-হি হ:াম্দান কাছীরান ত্বইয়িবাম মুবা-রাকাং ফীহি গইরা মাক্ফিইয়িন ওয়ালা- মুওয়াদ্দা'ইন ওয়ালা- মুস্তাগনান 'আনহু রব্বানা-।

অর্থঃ 'পাক পবিত্র, বরকতময় আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। তাঁর নে'মত হ'তে মুখ ফিরানো যায় না, তাঁর অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং এর প্রয়োজন থেকেও মুক্ত থাকা যায় না'। তাহ'লে তার পূর্বের গোনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/ ৪১৯৯; বাংলা মিশকাত হা/৪০১৭)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, খাদ্য গ্রহণের সময় দস্তরখানা বিছিয়ে খেতে হবে। কারণ খাওয়ার সময় কোন খাদ্য পড়ে গেলে তাতে যেন ময়লা না লাগে এবং তা যেন উঠিয়ে খওয়া যায়। সেজন্য দস্তরখানা বা দস্তরখানা জাতীয় কোন জিনিস যেমন পাটি, মাদুর ইত্যাদি বিছিয়ে খেতে হবে। আর এটা হচ্ছে নারীদের দায়িত্ব। খাওয়ার পরে আরো অনেক দু'আ আছে যে দু'আগুলি আদর্শ নারীদের নিজে পড়া এবং তা পরিবারের সকলকে পড়ার জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

আবু আইয়ুব বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন পান করতেন তখন বলতেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَ وَ سَقَى وَ سَوَّغَهُ وَ جَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا–

উচ্চারণঃ আল-হ:াম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আত‘আমা ওয়া সাক্বা- ওয়া সাউওয়াগাহূ ওয়া জা‘আলা লাহূ মাখরাজা-।

অর্থঃ ‘ঐ আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন এবং সহজভাবে প্রবেশ করালেন ও তা বের হওয়ার ব্যবস্থা করলেন’ (*আবুদাউদ, মিশকাত, হা/৪২০৭*)।

মুয়‘আয ইবনে আনাস তার পিতা হ’তে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আহার করবে অতঃপর বলবে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَطْعَمَنِى هَذَا وَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَ لاَ قُوَّةَ–

উচ্চারণঃ আল-হ:াম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আত‘আমানী হা-যা ওয়া রঝাক্বানীহি মিন গইরি হ:াওলিম মিন্নী ওয়ালা-কুউওয়াহ।

অর্থঃ ‘সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ পানাহার করালেন এবং এর সামর্থ প্রদান করলেন, যাতে ছিল না আমার কোন উপায়, ছিল না কোন শক্তি’ (*তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৪, সনদ ছহীহ-আলবানী*)। তাহ’লে তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য যে, দেশে প্রচলিত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَنَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(যঈফ আবু দাউদ, হা/৩৮৫০; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪২০৪-এর টীকা)।*

খাওয়ার শিষ্টাচারের মধ্যে আরো আছে যে, যখন কোন মাজলিসে এক সঙ্গে খেতে বসা হয় তখন সম্মানিত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকলে তাদের আগেই খাওয়া শুরু করা ঠিক নয়, যতক্ষণ না সেই সম্মানিত ব্যক্তিগণ শুরু করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/ ৪২৩৭; বাংলা মিশকাত হা/৪০৫৩)।*

খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করার পূর্বে তা মেপে নিতে হবে। এতে বরকত রয়েছে কেননা রাসূল (ছাঃ) এর বাণী, মিকদাদ ইবনে মাআদীকারীব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্যকে মেপে নেও। এতে তোমাদের জন্য বরকত দেওয়া হবে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/ ৪১৯৮; বাংলা মিশকাত হা/৪০১৬)*। খাদ্য

মেপে প্রস্তুত করার কারণ হচ্ছে যে, যখন খাদ্য মেপে পরিমাণ মত রান্না করা হবে তখন পরিবার সহ লোকদের কমও হবে না এবং বেশি হয়ে অপচয়ও হবে না। কম হ'লে পরিবারের লোক কষ্ট পাবে এবং বেশি হ'লে অপচয় হবে ও সাংসারিক ক্ষতি হবে, যা ঠিক নয়।

পেশাব পায়খানার আদবঃ

عن ابي هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ اُعَلِّمُكُمْ اِذْ اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا وَاَمَرَ بِثَلَثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهَى اَنْ يَسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য অনুরূপ যেমন পিতা পুত্রের জন্য। অর্থাৎ পিতা যেমন পুত্রকে যাবতীয় কিছু শিক্ষা দেয় তেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে (দ্বীন এমন কি পেশাব পায়খানার শিষ্টচারও) শিক্ষা দেই। তোমরা যখন পোশাব পায়খানায় যাবে তখন কেবলাকে সামনে ও পিছনে করবে না। তিনি ইস্তেঞ্জায় তিনটি ঢেলা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি গোবর হাড্ডি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতেও নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/ ৩৪৭; বাংলা মিশকাত হা/৩২০)*। উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, কেবলার দিকে মুখ করে এবং কেবলাকে পিছনে রেখে পেশাব পায়খানায় বসা যাবে না। এটা আদর্শ নারীর জন্য করণীয় যে সে যেন তার বাচ্চাদের ছোট থেকেই পূর্ব পশ্চিম দিকে মুখ করে পেশাব বা পায়খানা করতে বারণ করেন। তবে ঘেরাস্থলে কেবলাকে সামনে ও পিছনে করা যায়।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন প্রকৃতির ডাকে শৌচাগারে যেতেন তখন বলতেন, **اَللّٰهُمَّ اِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ.**

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ খুবুছি ওয়াল্ খাবা-য়িছ।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপবিত্র জিন ও অপবিত্রা জিন্নী হ'তে আশ্রয় চাচ্ছি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৩৩৭,পৃঃ ৩৪২; বাংলা মিশকাত হা/ ৩৩০ 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) যখন তার প্রয়োজন শেষে বের হ'তেন তখন বলতেন, غُفْرَانَـكَ *(গুফ্‌রা-নাকা)* 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৯, সনদ ছহীহ)*। উপরোক্ত হাদীছ দু'টি দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন কেউ টয়লেটে যাবে তখন বর্ণিত দো'আটি **اَللّٰهُمَّ اِنِّى أَعُوْذُبِـكَ مِـنَ الْخُبُـثِ وَ الْخَبَائِـثِ–** এবং বের হওয়ার সময় غُفْرَانَـكَ বলা সুন্নাত। যা বাস্তবায়ন করা আমাদের জন্য একান্ত যরূরী।

প্রকাশ থাকে যে, সমাজে প্রচলিত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيْ الْـأَذَى وَعَافَـانِيْ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/ ৩৭৪)*।

হযর আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাসূল (ছাঃ) বলেলেন তোমরা পেশাবের ছিটাফোটা হ'তে সাবধান থাক কেননা বেশির ভাগ কবরের আযাব এই কারণে হয়ে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একদা রাসূল (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বললেন, এদের উভয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন বিরাট ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। এদের একজন প্রশ্রাবকালে সতর্কতা অবলম্বন করত না। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে প্রশ্রাব হ'তে উত্তম রূপে পবিত্রতা লাভ করত না। আর অপর জন ছিল চোগলখোরী অর্থাৎ একজনের কথা অন্য জনকে লাগাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৩১১; মিশকাত হা/৩৩৮)*।

মুসলিম নর-নারী সকলের জন্য পেশাব থেকে সাবধান থাকা যরূরী। বিশেষ করে মহিলাদের ব্যাপারটা বেশি জটিল। কেননা তাদের পেশাব বেশি ছিটে যায় যা তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই পরহেজগার আদর্শ নারীর জন্য এ ব্যাপারে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা যরূরী। তবে যেটুকু সাধ্যের বাইরে সে ব্যাপারে আল্লাহ ভাল জানেন। কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পানি পান করে সে যেন পান পাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ না করে এবং যখন পায়খানায় যায় তখন যেন নিজের ডান হাতে নিজের গুপ্তাঙ্গ না ধরে এবং নিজের ডান হাত দ্বারা ইস্তেঞ্জা না করে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/ ৩৪০; বাংলা মিশকাত হা/ ৩১৩; বাংলা বুখারী ১ম খণ্ড, হা/ ১৫৩)*।

রাসূল (ছাঃ) তার উম্মাতকে যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ডান হাতে খেতে এবং পান করতে বলেছেন, কিন্তু ডান হাতে সৌচকার্য করতে নিষেধ করেছেন। আর বাম হাতে খেতে এবং পান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬২-৪১৬৩)*। কিন্তু বর্তমানে অনেককে দেখা যায় তারা বাম হাতে পান করা ভদ্রতা বলে মনে করে। যা শয়তানের অনুকরণ ছাড়া কিছুই নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে সারজেস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন গর্তে পেশাব না করে *(বাংলা মিশকাত হ/৩২৭)*।

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ اِتَّقُوْا اللاَّعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الَّذِيْ يَتَخَلَى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দুই অভিসপ্তের কারণ হ'তে বেঁচে থাকবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুই অভিসপ্ত কি? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, মানুষের চলার পথে এবং ছায়াস্থলে পায়খানা করা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৯; বাংলা মিশকাত হ/ ৩১২)*।

এক নযরে পেশাব পায়খানার আদবঃ

ক. কেবলাকে সামনে এবং পেছনে করে না বসা। তবে চতুর্দিকে ঘেরা স্থানে জায়েয। খ. টয়লেটে প্রবেশের সময় শয়তান হ'তে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাওয়া। গ. বের হওয়ার সময় 'গুফরানাকা' বলা। ঘ. বাম হাতে সৌচকার্য সম্পাদন করা। ঙ. গর্তে পেশাব না করা। চ. মানুষের চলাচলের পথে এবং ছায়াস্থানে পায়খানা না করা। ছ. পেশাব হ'তে সাবধান থাকা অর্থাৎ পেশাব পায়খানা হ'তে ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যরূরী। এজন্য পানি, ঢিলা, টিস্যু পেপার এগুলো তিন বার ব্যবহার করবে। শুকনা গবর ও হাড় ব্যবহার করা যাবে না। জ. পেশাবে সন্দেহ দূর করার জন্য কাপড়ের উপর থেকে লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটানো *(বাংলা মিশকাত হা/৩৩১ 'পেশাব পায়খানার আদব' অধ্যায়)*। ঞ. ইস্তেঞ্জার পর মাটিতে হাত ঘষা বা হাত উত্তমরূপে পরিষ্কার করা। ট. পানি দ্বারা সৌচকার্য সম্পাদন করা। প্রকাশ থাকে যে, পানি থাকলে ঢেলা বা টিস্যু ব্যবহার করা যাবে

না। দেশে অনেককে পেশাব-পায়খানার ক্ষেত্রে বিদ‘আত করতে দেখা যায়। পেশাবের পর ঢেলা নিয়ে হেঁটে বেড়ানো, ওঠা-বসা করা, পা উঁচু-নিচু করা ইত্যাদি নির্লজ্জ ও নোংরা কাজ। এসব পরিহার করা আবশ্যক।

عن ابي ايوب وجابر وانس رضي الله عنهم اِنَّ هذِهِ الاَيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللهِ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الاَنْصَارِ اِنَّ اللهَ قَدْ اَثْنَى عَلَيْكُمْ فِيْ الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ فَقَالَ فَهُوَ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ.

আবু আইয়ুব আনছারী, জাবের ও আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, যে আনছারীদের সম্পর্কে যখন এই আয়াত নাযিল হয় ’মসজিদে কুবায় এরূপ লোকেরা রয়েছে যারা পবিত্রতা লাভ করাকে ভালবাসে এবং আল্লাহ পবিত্রতা লাভকারীদের ভালবাসেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আনছারগণ! এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করলেন তোমাদের পবিত্রতার ব্যাপারে। তোমাদের পবিত্রতা কি? তারা বললেন, আমরা ছালাতের জন্য অযু করি, নাপাকি হ’তে গোসল করি এবং পানি দ্বারা শুচিতা লাভ করি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটাই তাই যার জন্য আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করলেন। সুতরাং তোমরা সর্বদা এটা করতে থাকবে। *(ইবনু মাজাহ বাংলা মিশকাত হা/৩৪১)*। অত্র হাদীছ ও আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করাই উত্তম। এছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) যখনই পায়খানায় যেতেন তখনই আমি তাঁর জন্য পানি নিয়ে যেতাম, যা দ্বারা তিনিইএস্তেঞ্জা করতেন এবং স্বীয় হাত মাটিতে ঘষে নিতেন।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন পায়খানায় যেতেন, তখন আমি ও অপর একটি বালক পানির পাত্র এবং বর্শাধারী একটি ছড়ি নিয়ে যেতাম। তিনি সেই পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাউদ, বাংলা মিশকাত হা/৩১৫)*।

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতেন। তবে যেখানে ঢিলার কথা উল্লেখ রয়েছে তা পানি না থাকার কারণে পানির পরিবর্তে ঢিলা ব্যবহান করতেন। তিনি কখনো পানি ও ঢিলা একসঙ্গে ব্যবহার করেননি। তাই এর বেশি কিছু করা বাড়াবাড়ি। যা বিদ’আতের পর্যায়ভুক্ত।

অনুরূপভাবে ভালভাবে ইস্তেঞ্জার নামে কাপড়ের টুকরা, পেপার ইত্যাদি দিয়ে টয়লেট ভর্তি করা, সন্দেহ দূর করার নামে কূলুখ ধরে ৪০ কদম হাঁটা, ওঠা-বসা করা এবং বিভিন্ন ভঙ্গিমায় কসরৎ করা যেমন ভিত্তিহীন তেমনিভাবে লজ্জাহীনতার শামিলও বটে যা পরিত্যাগ করা যরূরী। যারা পানি ও ঢিলা এক সাঙ্গে ব্যবহার করাকে উত্তম মনে করেন তাদের ধারণা ভিত্তিহীন।

পবিত্রতাঃ প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা একান্ত যরূরী। ইবাদতের পূর্বশর্ত হ'ল পবিত্রতা অর্জন করা। এটা দু'প্রকার। যথা- অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বলতে বুঝায় যাবতীয় শিরকী ও হিংসা-অহংকার, সন্দেহ, নিফাক, রিয়া, কৃপণতা, হেকদ, গিল, আত্মম্ভরিতা হ'তে অন্তরকে পবিত্র রাখা।

শিরকঃ অর্থ হচ্ছে আল্লাহ পাকের সঙ্গে অন্য কাইকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে ইবাদত-বন্দেগী করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট কোন কিছু চাওয়া। এই শিরক অত্যন্ত বড় গোনাহ। এ শিরকে গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন,

اَنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارَ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ.

'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন। আর তার বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৭২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে তাঁর সাথে শিরক করে। আর তিনি এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের পাপ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন' *(নিসা ৪৮)*। তাই শিরক থেকে অন্তরকে সার্বিকভাবে পবিত্র রাখতে হবে।

হিংসাঃ হিংসা হ'ল কারো কোন কল্যাণ দেখে দগ্ধ হওয়া ও তার ধ্বংস কামনা করা। এইে হিংসা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আসমান ও যমীনের সর্বপ্রথম পাপ। যা আসমানে ইবলীস আদম (আঃ)-এর প্রতি করেছিল এবং যমীনে আদম (আঃ)-এর পুত্র কাবীল হাবীলের প্রতি করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَ مِـنْ شَرِّ حَاسِـدٍ إِذَا حَـسَدَ 'আপনি বলুন, হিংসুকের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকট আশ্রয় চাই, যখন সে হিংসা করে' *(ফালাক্ব ৫)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং মুশরিক ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তার ভাইয়ের সাথে হিংসা পোষণ করে। ফিরিশতাদের বলা হয় সংশোধন হওয়া পর্যন্ত তাদের অবকাশ দাও *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৯; বাংলা মিশকাত হা/ ৪৮০৯)*। তাই হিংসা-বিদ্বেষের কলুষতা থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা একান্ত যরূরী।

অহংকারঃ এটা হচ্ছে হক বা সত্যকে স্বীকার না করা এবং মানুষকে হীন দৃষ্টিতে দেখা যা অধঃপতনের প্রধান কারণ। অহংকার যেমন মানুষকে সমাজে লাঞ্ছিত করে পরকালেও তেমনি জাহান্নামের অধিবাসী করে। ইবলীস তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইবলীস কেবল অহংকারের কারণে ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلاَّ اِبْلِيْسَ اَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ–

'আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করেছিল। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(বাক্বারাহ ৩৪)*।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে সে জাহান্নামে যাবে না। আর যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে যাবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*।

উপরোক্ত হাদীছ ও আয়াত ছাড়াও অহংকার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বহু বাণী ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ রয়েছে, যে গুলিতে অহংকার পরিত্যাগ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য যরূরী বলে উল্লিখিত হয়েছে।

সন্দেহঃ এটা হচ্ছে মতদ্বন্দ্ব এবং নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ দৃঢ়তা না থাকা। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা সন্দেহ করা হ'তে সাবধান থাক। কেননা প্রত্যেক সন্দেহই হচ্ছে বড় মিথ্যা' *(মিশকাত হা/৫০২৮; বাংলা মিশকাত হা/৪৮০৮)*।

নিফাক্ব বা মুনাফেকীঃ নিফাক্ব হচ্ছে বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফুরী পোষণ করা।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকবে সে প্রকৃত মুনাফিক হবে। (১) তার নিকট আমানত রাখা হ'লে তা খিয়ানত করে (২) কথা বললে মিথ্যা বলে (৩) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে (৪) যখন ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তখন অশ্লীল কথা বলে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২; বাংলা মিশকাত হা/৫৫০)।*

মুনাফিক্বের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক্বের পরিণতি সম্পর্কে বলেন,

اِنَّ الْمُفِقِيْنَ فِيْ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدْ لَهُمْ نَصِيْرًا

'নিঃসন্দেহে মুনাফিকের স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ১৪৫)*। অতএব অন্তরকে এসব থেকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

রিয়াঃ রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত যা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) তার উম্মতকে সাবধান করে বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য যে জিনিসের বেশী ভয় পাই তা হচ্ছে ছোট শিরক অর্থাৎ রিয়া বা লৌকিকতা। সুতরাং রিয়া হ'তে সাবধান থাকতে হবে।

কৃপণতাঃ অর্থ-সম্পদ নিজের বা অন্যের প্রয়োজনে খরচ না করে জমা করে রাখা। এমনকি নিঃস্ব-অসহায় মানুষকে দান-ছাদাক্বা না করে সঞ্চয়ের মানসিকতাই হচ্ছে কৃপণতা। কৃপণতা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা অত্যাচার করা হ'তে সাবধান থাক। কেননা ক্বিয়ামতের দিন হবে অন্ধকার। তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। কারণ কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদেরকে অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করার প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি উৎসাহিত করেছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা১৮৬৫; বাংলা মিশকাত ৪র্থ খণ্ড, হা/১৭৭১)।*

হিকদ, গিল বা শক্রুতা পোষণ করাঃ উহা হচ্ছে মুমিনদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, যা একেবারেই অবৈধ। আল্লাহ বলেন,

وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا

'যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে' *(আহযাব ৫৮)*। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি হ'তে নিজেকে পরিশুদ্ধ করাই হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা অর্জন করা।

পক্ষান্তরে বাহ্যিক পবিত্রতা বলতে বুঝায় শারঈ তরীকায় ওযূ, গোসল বা তায়াম্মুম ইত্যাদি সম্পন্ন করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তর থেকে তওবাকারী ও বাহ্যিকভাবে পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২২২)*।

রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تُقْبَلُ الصَّلاَةُ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ ولاَ صَدَقَةَ مِنْ غُلُوْلٍ

'পবিত্রতা ব্যতীত কারো ছালাত কবুল হয় না এবং হারাম মালের ছাদাকা কবুল হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। প্রত্যেক মুছল্লীর জন্য দৈহিক পবিত্রতার সাথে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন করাও একান্ত যরূরী। কেননা বাহ্যিক পবিত্রতার ফলে মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়। ইসলামে দৈহিক পবিত্রতা হাছিলের জন্য তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। তা হচ্ছে ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম। ওযূর আভিধানিক অর্থ পরিচ্ছন্নতা ও জ্যোতি। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহর নামে পবিত্র পানি দ্বারা শারঈ পদ্ধতিতে হাত, মুখ, পা, ধৌত করা এবং মাথা মাসাহ করাকে ওযূ বলে।

ওযূর ফরয চারটি। যথা- মুখমণ্ডল ধৌত করা, কনুই সহ হাত ধৌত করা, মাথা মাসাহ করা এবং পদযুগল টাখনু সহ ধৌত করা। এমর্মে আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা ছালাতের জন্য প্রস্তুত হও তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর ও পদযুগল টাখনু সহ ধৌত কর' (মায়েদাহ ৬)। অত্র আয়াত দ্বারা বঝা যায় যে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল, দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা এবং পদযুগল টাখনু পর্যন্ত ধৌত করাই হচ্ছে ওযূর ফরয।

ওযূর মাহাত্ম্যঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি কি তোমাদের বলে দিব না যে, আল্লাহ কিসের দ্বারা মানুষের গোনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল (ছাঃ) বললেন,

কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপে গমন করা এবং এক ছালাত শেষ করার পর অপর ছালাতের প্রতিক্ষায় থাকা' *(মুসলিম, মিশকাত, বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২৬৩)*।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوَضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتَ اَظْفَارِهِ-

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং উত্তমরূপে ওযূ করে, তার গুনাহ সমূহ তার শরীর হ'তে বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নিচ হ'তেও বের হয়ে যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/২৬৪, ২য় খণ্ড)*।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اِمْرِءٍ مُّسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهَا وَخُشُعَهَا وَرُكُعَهَا اِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةٌ لِّمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَالَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةٌ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ-

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন মুসলমানের নিকট ফরয ছালাতের সময় উপস্থিত হয়। আর সে উত্তমরূপে ওযূ করে, ছালাতের একাগ্রতা, রুকূ, সিজদা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে তার ঐ ছালাত পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। যতক্ষণ না সে কবীরা গুনাহ করে। আর এটা সর্বদা হয়ে থাকে' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২৬৬)*।

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ওযূ করবে এবং উত্তমরূপে অথবা বলেছেন ওযূকে সমস্ত নিয়মের সাথে পরিপূর্ণ করবে অতঃপর বলবে,

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ-

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল'। অন্য বর্ণনায় আছে,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মাদ (ছঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল’। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে’ *(ইমাম মুসলিম তাঁর ছহীহ গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন, বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২৫৯)।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘কাল ঘোড়া সমূহের মধ্যে কপালে চিতা (অর্থাৎ যার কপাল সাদা) বিশিষ্ট ঘোড়া যেভাবে চেনা যায় ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের ওযূর অঙ্গগুলি উজ্জল হওয়ার কারণে আমি তাদের চিনতে পারব এবং তাদের হাউয কাওছারের পানি পান করানোর জন্য আমি আগেই পৌঁছে যাব। অতএব যে চায় সে যেন তার উজ্জ্বলতাকে বৃদ্ধি করে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৮; বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২৭৮)।*

ওযূর বিবরণঃ ওযূর পূর্বে ভালভাবে মিসওয়াক করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আমি যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করতাম তাহ’লে এশার ছালাত দেরী করে পড়ার এবং প্রত্যেক ছালাতের পূর্বে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

অতএব ঘুম থেকে উঠে এবং প্রত্যেক ছালাতের জন্য ওযূ করার পূর্বে মিসওয়াক করা উত্তম। এ সময় জিহ্বার উপর হাত ঘষে গড়গড়া করা উচিত।

ওযূ করার নিয়মঃ রাসূল (ছাঃ)-এর সার্বিক জীবনের ওযূর হাদীছগুলি একত্রিত করলে ওযূর নিয়ম হবে নিম্নরূপ- প্রথমে মনে মনে ওযূর নিয়ত করে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে ওযূ শুরু করা। ডান হাতে পানি দিয়ে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধৌত করা এবং এক হাতের আঙ্গুল দিয়ে অপর হাতের আঙ্গুল খিলাল করা। আঙ্গুলে আংটি থাকলে সেটা ভাল করে নাড়িয়ে সেখানে পানি পৌঁছানো। তারপর কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া। এরপর সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা। পুরুষদের দাড়ির ভিতরে পানি দিয়ে খিলাল করা। অতঃপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা (প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত)। তারপর দুই হাত ভিজিয়ে মাথা মাসাহ করা। মাসাহ করার সময় দুই হাতের আঙ্গুল এক জায়গায় করে সামনের দিক হ’তে পিছনের ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে পুনরায় সামনে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। মাথায় পাগড়ী থাকলে তার উপর মাসাহ করা। এরপর ভিজা শাহাদত আঙ্গুল দু’টি দুই কানের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দু’টি দুই কানের পিঠের উপর

হ’তে নিচ পর্যন্ত মাসাহ করা। তারপর প্রথমে ডান ও পরে বাম পায়ের টাখনু পর্যন্ত ভালভাবে ধৌত করা এবং পা ধোয়র সময় বাম হাতের আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা। প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা উত্তম। শুধু মাথা ও কান একবার মাসাহ করা। এভাবে ওযূ শেষ করার পর সামান্য পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর কাপড়ের উপরে ছিটিয়ে দেওয়া সুন্নাত। তারপর ওযূ শেষ করে নিম্নোক্ত দো‘আ পাঠ করা।

أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَـهَ إلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيْكَ لَـهُ وَ أَشْـهَدُ أنَّ مُحَمَّـدًا عَبْـدُهُ وَ رَسُـوْلُهُ–اَللّٰهُـمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ–

উচ্চারণঃ *আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌:দাহূ লা- শারীকালাহূ ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহ:াম্মাদান ‘আব্‌দুহূ ওয়া রসূলুহ। আল্ল-হুম্মাজ ‘আলনী মিনাত তাওওয়া-বীনা ওয়াজ‘আলনী মিনাল মুতাত্বহ্‌হিরীন।*

অর্থঃ ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর’ *(ছহীহ তিরমিযী, মিশকাত হা/২৮৯; ইরওয়া হা/৯৬-এর আলোচনা দ্রঃ সনদ ছহীহ; মুসলিম, মিশকাত ৩৯ পৃঃ হা/২৮৯ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়)*।

ওযূ সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

(১) ওযূর অঙ্গগুলি এক হ’তে তিনবার ধোয়া যাবে। তবে রাসূল (ছাঃ) তিনবার করেই অধিকাংশ সময় ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা৩৯৭; বাংলা বুখারী ১ম খণ্ড ১৫৮/১৫৯)*।

(২) ওযূর অঙ্গগুলির মধ্যে সামান্যতম জায়গা শুকনা থাকলে ওযূ হবে না *(বুলূগুল মারাম হা/৫০; বাংলা বুখারী ১ম খণ্ড, হা/১৩৫)*।

(৩) ওযূর জন্য ব্যবহৃত পানি বা ওযূর শেষে পাত্রের পানি নাপাক হয় না। বরং তা দিয়ে পুনরায় ওযূ বা পবিত্রতা হাছিল করা যায় *(বাংলা বুখারী ১ম খণ্ড হা/১৫৫)*।

(৪) ওযূর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যরূরী *(মায়েদা ৩৩)*।

(৫) ওযূর অঙ্গে যখম থাকলে ও তাতে পট্টি বাধা থাকলে এবং তাতে পানি লেগে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে তার উপর ভিজা হাতে মাসাহ করা যায় *(বুলূগুল মারাম হা/১১৪ 'তায়াম্মুম' অধ্যায়)*।

(৬) মোযার উপর মাসাহ করা যায়। পবিত্র অবস্থায় ওযূ করে মোযা পরিধান করলে মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত মাসাহ করা যায় *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৬)*। উল্লেখ্য, সুস্থ ব্যক্তির জন্য জানাবাতের (অপবিত্রতার) গোসলের সময় মোযা খুলতেই হবে।

(৭) ওযূর অঙ্গগুলি ডান দিক থেকে ধৌত করা সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৪১)*।

(৮) কোন পুরুষের ওযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারা অন্য যে কোন মহিলা ওযূ করতে পারে *(বঙ্গানুবাদ বুখারী ১ম খণ্ড হা/১৯৩)*।

(৯) ওযূ শেষে পবিত্র তোয়ালে, গামছা বা অনুরূপ কিছু কাপড় দিয়ে ভিজা অঙ্গ মোছা যায়।

(১০) এক ওযূতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা যায় *(বাংলা মিশকাত হা/২৮৭)*।

(১১) ওযূতে মাথা ও কান মাসাহ করার পর দুই হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসাহ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ ব্যাপারে একটি হাদীছ পাওয়া যায়, যাকে ইমাম নববী জাল বলেছেন।

(১২) মুখে ওযূর নিয়ত পড়ার কোন দলীল নেই। ওযূর সময় বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে পৃথক কোন দো'আ নেই। যারা পৃথক দো'আর কথা বলেন, তাদের কথা ভিত্তিহীন। ওযূর শেষে সূরা কদর পাঠ করারও কোন দলীল নেই।

যেসব কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়ঃ রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ওযূ ভঙ্গের কারণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলি নিম্নরূপঃ

(১) পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হ'লে ওযূ ভেঙ্গে যায় *(আবুদাউদ, বাংলা মিশকাত হা/২৮১)*।

(২) উটের গোশত খেলে ওযূ ভেঙ্গে যায় *(বাংলা মিশকাত হা/২৮৪)*।

(৩) সম্পূর্ণ ঘুমিয়ে গেলে *(বাংলা মিশকাত হা/২৯৩)*।

(৪) যৌন উত্তেজনা সহ যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে।

(৫) পেটের গোলমালের জন্য কেউ যদি সন্দেহে পতিত হয় তাহ'লে শব্দ, গন্ধ বা কোন চিহ্ন না পাওয়া পর্যন্ত ওযূ করার প্রয়োজন নেই।

ফরয তরক হ'লে অর্থাৎ হাটুর উপর কাপড় উঠে গেলে ও মেয়েদের মাথার কাপড় পড়ে গেলে ওযূ ভেঙ্গে যায় এর কোন দলীল নেই। অনেকের ধারণা বাচ্চাকে দুধপান করালে, ছোট বাচ্চাদের সৌচ কাজ করিয়ে দিলে বা কুকুরের গায়ের সঙ্গে কাপড় লেগে গেলে ওযূ ভঙ্গ হয়, এটাও ভুল ধারণা। উল্লেখ্য যে, ওযূ ভঙ্গের কারণ সমূহের মধ্যে যেসব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়া বাকী অন্য কোন কারণে ওযূ ভঙ্গ হয় না।

গোসলের বিবরণঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنْحِي فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْباً فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْقُصُ يَدَيْهِ.

আবুদল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (আমার খালা) মায়মুনা (রাঃ) বলেন, এশবার আমি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। অতঃপর একটা কাপড় দ্বারা তাকে পর্দা করলাম। তিনি প্রথমে নিজের দুই হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং (কব্জি পর্যন্ত) ধৌত করলেন। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। তারপর হাত মাটিতে ঘষলেন এবং উহাকে মুছে নিলেন। অর্থাৎ মাটি দ্বারা হাত মাঝলেন। অতঃপর পুনরায় হাত ধৌত করলেন, কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করলেন। অর্থাৎ ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করলেন। কিন্তু পা ধৌত করলেন না)। অতঃপর মাথার উপর পানি ঢাললেন এবং সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করলেন। এরপর তিনি পূর্বের স্থান হ'তে কিছু দূরে সরে গিয়ে দুই পা ধৌত করলেন। অতঃপর আমি তার শরীরের পানি মোছার জন্য কাপড় দিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না, হাত দু'টি ঝাড়তে ঝাড়তে

চলে গেলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, কিন্তু ইবারত বুখারীর, বঙ্গানুবাদ বুখারী ১ম খণ্ড. হা/২৭৬; বাংলা মিশকাত হা/৪০০)*।

গোসল অর্থ ধৌত করা। শারঈ পরিভাষায় পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে ওযূ করে সর্বাঙ্গ ধৌত করাকে গোসল বলে। উপরোল্লিখিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর গোসলের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং জানাবাতের গোসলের জন্য দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। পরে নাপাকী পরিষ্কার করে পা না ধুয়ে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করতে হবে। এরপর একটু দূরে সরে গিয়ে পা ধৌত করতে হবে। তবে সমস্ত শরীরে পানি ঢালার পূর্বে মাথায় তিনবার পানি ঢালাও সুন্নাত *(বঙ্গানুবাদ বুখারী, ১ম খণ্ড, হা/২৬৫)*।

গোসল সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

(১) যে কোন কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা সুন্নাত। তাই গোসলের প্রথমেও 'বিসমিল্লা' বলতে হবে।

(২) গোসলের ওযূর সময় পা না ধুলেও কোন দোষ নেই। পরে ধুলেও চলবে *(বাংলা মিশকাত হা/৪০০)*।

(৩) গোসলের স্থান হ'তে একটু সরে গিয়ে পায়ে পানি ঢালা। আর এটা অপবিত্র পানি গায়ে ছিটে আসার ভয় থাকলে *(বাংলা মিশকাত হা/৪০০)*।

(৪) মহিলাদের মাথার খোপা বা বেনি না খুললেও চলবে। তবে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে *(বাংলা মিশকাত হা/৪০২)*।

(৫) পুরুষ-মহিলা সকলের জন্য পর্দা করে গোসল করা যরূরী *(বাংলা মিশকাত হা/৪০০)*।

(৬) অপবিত্রতা দূর করার পর মাটি, সাবান ইত্যাদি দ্বারা হাত পরিষ্কার করতে হয় *(বাংলা মিশকাত হা/৪০০)*।

(৭) স্বামী-স্ত্রী মিলনের কারণে অপবিত্র হ'লে ছালাত, ছিয়াম, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদত ব্যতীত সব ধরনের কাজ-কর্ম, খাওয়া-দাওয়া, পান করা, চলা-ফেরা করা সব বৈধ। তবে ওযূ করা সুন্নাত *(বাংলা বুখারী হা/২৮৬, ২৮৪)*।

গোসলের প্রকারভেদঃ গোসল দু'ধরনের। যথা- (ক) ফরয গোসল (খ) মুস্তাহাব গোসল।

ফরয গোসলঃ হায়েয, নিফাস, স্ত্রী মিলন ও স্বপ্নদোষ হ'তে পবিত্রতা অর্জনের জন্য যে গোসল করতে হয় তাকে ফরয গোসল বলে।

মুস্তাহাব গোসলঃ যে গোসল করলে নেকী আছে, না করলে কোন দোষ নেই। যেমন-

(১) জুম‘আর ছালাতের পূর্বে গোসল করা।

(২) মুর্দাকে গোসল করানোর পর গোসল করা।

(৩) ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা।

(৪) হজ্জ বা ওমরার ইহরাম বাধার পূর্বে গোসল করা।

(৫) আরাফার দিন গোসল করা।

(৬) দুই ঈদের দিন গোসল করা।

তায়াম্মুমের বিবরণঃ

তায়াম্মুম অর্থ সংকল্প করা। পারিভাষিক অর্থে পানি না পাওয়া গেলে ওযূ ও গোসলের পরিবর্তে পাক মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতিকে তায়াম্মুম বলে। আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا، فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ–

‘যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা সফরে থাক অথবা পায়খানা থেকে আস কিংবা স্ত্রী স্পর্শ করে থাক, আর যদি পানি না পাও তাহ'লে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর’ *(মায়েদাহ ৬)*।

তায়াম্মুমের পদ্ধতিঃ আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট আসল এবং বলল আমি না পাক হয়েছি কিন্তু পানি পাইনি। এসময় আম্মার (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, এক সফরে আমি ও আপনি ছিলাম এবং উভয়ে নাপাক ছিলাম। আপনি পানির অভাবে ছালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর কোন এক সময়

রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে নবী করীম (ছাঃ) আপন হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁক দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ করলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৫২৮)* ।

ওযূর প্রথমে বিসমিল্লাহ না বললে ওযূ পূর্ণ হয় না। তায়াম্মুম ওযূর স্থলাভিষিক্ত *(মিশকাত হা/৪০২; বাংলা মিশকাত হা/৩৭০)।*

অতএব 'বিসমিল্লাহ' বলে পবিত্র মাটির উপর দু'হাত মেরে তাতে ফূঁক দিয়ে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার মাসাহ করতে হবে *(বাংলা বুখারী হা/৩৩৮; বাংলা মিশকাত হা৪৯৩)* ।

যেসব কারণে তায়াম্মুম করতে হয়ঃ

(১) যদি পবিত্র পানি না পাওয়া যায় এবং পানি সংগ্রহ করতে গেলে ছালাত কাযা হওয়ার আশংকা থাকে *(মায়েদাহ ৬)*। (২) পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে এবং জীবনের ঝুকি থাকলে *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৩১-৫৩২)।*

উপরোক্ত কারণ সমূহের প্রেক্ষিতে ওযূ বা গোসলের পরিবর্তে প্রয়োজনে দীর্ঘদিন এমনকি দশ বছর হ'লেও তায়াম্মুম করা যাবে *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৩০; বাংলা মিশকাত হা/৪৯৫)।*

তায়ম্মুম সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ

(১) তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করার পর উক্ত ছালাতের সময়ের মধ্যে পানি পাওয়া গেলেও পুনরায় ঐ ছালাত আদায় করতে হবে না। তবে করলে কোন দোষ নেই *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৩৩; বাংলা মিশকাত হা/৪৯৭)*।

(২) ওযূ ও গোসলের মাধ্যমে যেসব কাজ করা যায় তায়াম্মুম করেও সেসব কাজ করা যায়। এমনিভাবে যেসব কারণে ওযূ ভেঙ্গে যায় তায়াম্মুমও সেসব কারণে ভেঙ্গে যায়। কারণ তায়াম্মুম ওযূ ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত।

(৩) যদি মাটি পানি কিছুই পাওয়া না যায় তাহ'লে বিনা ওযূতেই ছালাত আদায় করতে হবে *(বাংলা বুখারী ১ম খণ্ড, হা/৩৩৬)।*

হায়েয ও নেফাসের আলোচনাঃ হায়েযের আভিধানিক অর্থ ঋতুস্রাব। পারিভাষিক অর্থে কোন রোগ ও আঘাত ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের জরায়ু থেকে প্রতি মাসে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে হায়েয বলে। আর সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হয় তাকে নেফাস বলে।

হায়েয ও নেফাসের সময়সীমাঃ হায়েযের নিম্ন সময়ের কোন সীমা নেই। তবে ঊর্ধ্ব সময় ছয়দিন বা সাত দিন *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬১; বাংলা মিশকাত হা/৫১৬)।*

অনুরূপভাবে নেফাসেরও কোন নিম্ন সময়সীমা নেই। তবে ঊর্ধ্ব সময় হচ্ছে ৪০ দিন *(ইরওয়া ১ম খণ্ড, হা/২০১)।*

হায়েয অবস্থায় যেসব কাজ করা নিষেধঃ রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষ্য হ'তে যেসব কাজ নিষেধ বলে জানা যায় তা হচ্ছে- ছালাত, ছিয়াম, কা'বা ঘরের তাওয়াফ ও যৌনসঙ্গম ব্যতীত যাবতীয় কাজকর্ম করা জায়েয। তবে ছিয়ামের কাযা পরে আদায় করতে হবে। হায়েয ও নেফাসের হুকুম একই *(বাক্বারাহ ২২২; বাংলা মিশকাত হা/৫১৪; মুসলিম, মিশকাত হা/২০০২; বাংলা বুখারী হা২৯৪)।*

হায়েয হ'তে পবিত্রতা লাভের উপায়ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَيْفَ اغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيْضِ قَالَ خُذِيْ فُرْصَةً مُمَسِّكَةً فَتَوَضَّى ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَحِيَا فَاعْرَضَ بِوَجْهِهِ أَوْ قَالَ تَوَضَّى بِهَا فَاخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيْدُ النَّبِيُّ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একজন আনছারী মহিলা আল্লাহর রাসুল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি কিভাবে হায়েযের গোসল করব? আল্লাহর রাসূল বললেন, এক টুকরা কস্তুরীযুক্ত নেকড়া নেও এবং তিন বার ধুয়ে নেও। রাসূল (ছাঃ) লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন এবং বললেন, তা দিয়ে তুমি পবিত্র হও। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম। তারপর তাকে নবী করীম (ছাঃ)-এর কথার মর্ম বুঝিয়ে দিলাম *(মূল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫; বাংলা*

বুখারী, ১ম খণ্ড, হা/৩১৫)। আয়েশা (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় আছে, তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন বিশেষভাবে মুছে ফেল *(মূল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫; বাংলা বুখারী, ১ম খণ্ড, হা/৩১৪)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, হায়েয হ'তে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিশেষ কোন নিয়ম নেই। তবে গোসলের পূর্বে তুলা অথবা নেকড়ায় সুগন্ধি লাগিয়ে তা দিয়ে রক্তের দাগ বা চিহ্ন তিনবার মুছে ফেলার কথা হাদীছে এসেছে।

উল্লেখ্য, যারা হায়েয হ'তে পবিত্রতা লাভের জন্য লবন এবং বরইপাতা দিয়ে গরম পানির কথা বলেন তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। সুতরাং তাদের ঐ কথা ভিত্তিহীন।

ইস্তেহাযাঃ ইস্তেহাযা হচ্ছে এক ধরনের রোগ, যা স্ত্রী লোকের হয়ে থাকে। হায়েযের ৬/৭ দিন পরে এবং নেফাসের ৪০ দিন পরে যে রক্তস্রাব অব্যাহত থাকে তাকে ইস্তেহাযা বলে। আর ইস্তেহাযার রোগীকে মুস্তাহাযা বলে। হায়েয ও নেফাস অবস্থায় যে সমস্ত কাজ হারাম ইস্তেহাযা রোগীর জন্য উক্ত কাজগুলি জায়েয।

ইস্তেহাযা রোগীর করণীয়ঃ ইস্তেহাযা রোগীর জন্য প্রত্যেক ছালাতের পূর্বে গোসল করে ছালাত আদায় করতে হবে *(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭; বাংলা বুখারী, ১ম খণ্ড, হা/৩২৭)*। আর যদি তাতে সমর্থ না হয় তাহ'লে যোহরের ছালাতকে একটু পিছিয়ে এবং আছরের ছালাত একটু এগিয়ে একই গোসলে দুই ছালাত আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে মাগরিবকে একটু পিছিয়ে দিয়ে এবং এশার ছালাতকে একটু এগিয়ে নিয়ে এক গোসলে দুই ওয়াক্তের ছালাত আদায় করতে হবে। আর ফজরের জন্য আলাদাভাবে এক বার গোসল করতে হবে। এভাবে তিনবার গোসল করে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে হবে *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬১; বাংলা মিশকাত হা/৫১৬)*। আর তাও সম্ভব না হ'লে প্রত্যেক ছালাতের পূর্বে রক্ত ধুয়ে ওযূ করে ছালাত আদায় করবে *(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭; বাংলা বুখারী ১ম খণ্ড, হা/৩৩১; বাংলা মিশকাত হা/৫১৩)*। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহ'লে বিনা ওযূতে ছালাত আদায় করতে হবে।

হায়েয সম্পর্কে অন্যান্য মাসআলা সমূহঃ

(১) হায়েয অবস্থায় স্বামীর সাথে সঙ্গম ব্যতীত উঠা-বসা, এক চাদরে শোয়া সহ সকল কাজ জায়েয *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫; বাংলা মিশকাত হা/৫০০)*।

(২) হজ্জের সময় কা'বা ঘর তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের যাবতীয় কাজ সমাধা করতে পারে *(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪; বাংলা বুখারী ১ম খণ্ড, হা/৩০৫)*।

(৩) হায়েয হ'তে পবিত্রতা অর্জনের জন্য সাবান, সোডা দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করা এবং মাথায় সাবান দেয়া শর্ত নয়। সাবান, সোডা কিছুই না থাকলে শুধুমাত্র গোসল করে ছালাত আদায় করতে হবে *(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪-৪৫; বাংলা বুখারী, ১ম খণ্ড, হা/৩০৬)*।

(৪) কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগলে তা শুধু পানি দিয়ে ধুয়ে ছালাত আদায় করা যথেষ্ট *(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪-৪৫; বাংলা বুখারী, হা/৩০৬-৩০৭)*।

(৫) হায়েয অবস্থায় হলুদের পাত্রে হাত দেওয়া যাবে না, ধানের গোলায় ও ক্ষেতে যাওয়া যাবে না, এগুলি ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার বৈ কিছুই নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী কা'বা ঘর তাওয়াফ, ছালাত, ছিয়াম এবং যৌনসঙ্গম ব্যতীত হায়েয ও নেফাস অবস্থায় সব ধরনের কাজ করা বৈধ।

(৬) কেউ যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয় এবং গোসল না করে ছিয়ামের নিয়ত করে তবে তার ছিয়াম পূর্ণ হবে *(বাংলা বুখারী, হা/১৯২৫-২৬, 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। অনুরূপ কারো যদি সূর্যাস্তের পূর্বে হায়েয শুরু হয় তবে তার ছিয়াম বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৭) হায়েয হ'তে পবিত্রতা অর্জনের জন্য কেউ যদি ওযূ, গোসল কোনটাই করতে সক্ষম না হয় তবুও তাকে ছালাত, ছিয়াম সহ যাবতীয় ইবাদত আদায় করতে হবে *(মায়েদা ৬)*।

(৮) হায়েয হ'তে পবিত্রতা অর্জনের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা যরূরী *(মূল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫;)*।

ঈমান

ঈমানের পরিচয়ঃ إيمان শব্দটি أمن হ'তে নির্গত। ঈমানের শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা, আত্মার প্রশান্তি লাভ। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ এবং তাঁর

রাসূলের প্রতি, অবতারিত কুরআনের উপস্থাপিত বিষয় সমূহকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ–

‘ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। তন্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ঈমান অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা‘বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল এ সাক্ষ্য দেওয়া *(মূল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮; বঙ্গানুবাদ বুখারী, হা/৮; বাংলা মিশকাত হা/২-৩)*।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا أَمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلًا بَعِيْدًا–

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। আরো বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তাঁর কিতাবের প্রতি যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন স্বীয় রাসূলের প্রতি। আর ঐ সমস্ত কিতাবের প্রতি যেগুলি ইতিপূর্বে নাযিল করা হয়েছে। যে অস্বীকার করবে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে এবং পুনরুত্থান দিবসকে সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে সরে যাবে’ *(নিসা ১৩৬)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِيْ الْأَرْضِ وَلاَ فِيْ اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلُ اَنْ تَبْرَّاَهَا

‘পৃথিবীতে ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদ-আপদই আসুক না কেন, তা আমি পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই লাওহে মাহফূযে লিখে দিয়েছি’ *(হাদীদ ২২)*।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানের স্তম্ভ হচ্ছে ছয়টি। যথা- (১) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (২) তাঁর নবী-রাসলগণের প্রতি বিশ্বাস (৩) তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস (৪) তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস (৫) শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস (৬) তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস।

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ হচ্ছে তাঁর অস্তিত্বে, একত্ববাদে, তাঁর ছিফাত বা গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি একক চিরস্থায়ী ও পরাক্রমশালী।

২. নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসঃ নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস অর্থ আদম (আঃ) হ'তে শুরু করে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত যত নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন তাঁদের প্রতি একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁদেরকে সত্য বলে স্বীকার করা।

৩. কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাসঃ কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে পবিত্র কুরআন ছাড়াও পৃথিবীর শুরু হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত যত কিতাব আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সেগুলির উপর ঈমান আনা। যদিও সেগুলি আমরা দেখিনি।

৪. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস ঃ ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ হচ্ছে তাঁরা নূরের তৈরী। তাঁরা নারী বা পুরুষ কোনটাই নন। তাঁরা ইচ্ছানুসারে রূপ পরিবর্তন করতে পারেন। তাঁরা অদৃশ্য তাদের আমরা দেখতে পারি না। তাঁরা কখনো পানাহার করে না এবং নিদ্রা যায় না। তাঁরা আল্লাহর সৃষ্টিজগতের নানাবিধ কাজে সর্বদা নিয়োজিত। তাঁরা কখনো আল্লাহর হুকুম অমান্য করেন না। এগুলি মনে প্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান আনাঃ আখিরাতের বিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে পরকালে আল্লাহ আবার মানুষকে জীবিত করবেন এবং তাদের কৃতকর্মের হিসাব নিবেন। বিচারের পর প্রত্যেকের কর্মফল অনুযায়ী জান্নাত কিংবা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আখিরাতের এই সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

৬. তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসঃ তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে মানব জীবনে কল্যাণ-অকল্যাণ, বিপদাপদ, সুখ-দুঃখ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ হ'তে হয়ে থাকে। এতে কারো কোন হাত বা ক্ষমতা নেই। এ বিষয়গুলিকে সত্য বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা।

ঈমানের পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার জন্য আল্লাহ জিবরীল (আঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি এসে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ঈমান সহ ইসলামের

অন্যান্য মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ছাহাবীগণকে অবহিত করেন। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) জন সমক্ষে বসেছিলেন। এমন সময় এক অপরিচিত ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঈমান হল আপনি বিশ্বাস স্থাপন করবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি। তখন প্রশ্নকারী ব্যক্তি বললেন, হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন। তারপর লোকটি দ্বীন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর চলে গেলেন। তখন রাসূল বললেন, তিনি হচ্ছেন জিবরীল (আঃ)। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।

কুরআন-হাদীছ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার সাথে সাথে বাকি বিষয় সমূহের প্রতি দৃঢ় মনোবলের সঙ্গে আস্থা স্থাপন করাই হচ্ছে ঈমান। তাই সকল নারী-পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ না করা। বিশেষ করে আদর্শ নারী হিসাবে প্রত্যেক নারীর উচিত বাল্যাবস্থায়ই সন্তান-সন্ততিকে ঈমান সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতি আস্থা স্থাপনের শিক্ষা দেওয়া। অন্ততঃ এতটুকু ধারণা দিতে হবে যে, দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব কিছুর স্রষ্টা

আল্লাহ তা‘আলা। তিনি সব কিছুর মালিক, প্রতিপালক ও রক্ষক।

ঈমানের অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলীঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الإِيْمَانِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছঃ) বলেছেন, ‘ঈমানের ষাটের অধিক শাখা রয়েছে। আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা’ *(মূল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮; বঙ্গানুবাদ বুখারী ১ম খণ্ড, হা/৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الأذى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الإِيْمَانِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেছেন, 'ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এই ঘোষণা দেওয়া এবং সবচেয়ে নিম্ন স্তরেরটি হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের এশটি শাখা' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪)*।

প্রথম হাদীছে ষাটটি ও দ্বিতীয় হাদীছে সত্তরটির অধিক ঈমানের শাখা-প্রশাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে ষাটটি ও সত্তরটি উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে ঈমানের বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। ঐসব শাখা-প্রশাখার সমন্বয়ে মুমিনের ঈমান পরিপূর্ণ হয়। যার মধ্যে ঈমানের সব শাখা বিদ্যমান তাকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন বলে গণ্য করা হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে ঈমানের সব শাখা বিদ্যমান থাকে না তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ নয়। আল্লাহ বলেন, 'আমি তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম' *(কাহাফ ১৩)*। 'যাতে মুমিনদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়' *(মুদ্দাছছির ৩১)*। উপরোক্ত হাদীছ দু'টিতে ঈমানের সর্বোত্তম ও সর্বনিম্ন শাখা উল্লেখ করার সাথে সাথে মধ্যস্থিত আরেকটি শাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা লজ্জাশীলতার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কারণ লজ্জা মানুষকে অনেক অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। রাসূল (ছাঃ) লজ্জাকে কল্যাণ বলেও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, লাজুকতা পূণ্য ও কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই আনয়ন করে না। অন্য এক বর্ণনায় আছে লজ্জার সর্বাংশই উত্তম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৫০)*। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, লজ্জার পুরোটাই কল্যাণময়।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ–

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পূর্ববর্তী নবীদের বাণী হ'তে পরবর্তী লোকেরা (অবিকৃতাবস্থায়) যা পেয়েছে (আজো যা

বিদ্যমান) তা হচ্ছে যখন তুমি লজ্জাহীন হবে তখন তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮৫১)*।

প্রথম হ'তে শেষ নবী পর্যন্ত অনেক বিধিবিধান, আচার-আচরণ পরিবর্তন হ'লেও লজ্জার বিধান বহাল রেখে প্রথম নবী হ'তে শেষ নবী পর্যন্ত লজ্জার গুরুত্ব একই রকম রয়েছে। অর্থাৎ লজ্জা ঈমানের এমন একটি শাখা যা মানুষের মধ্য হ'তে বিলুপ্ত হ'লে ঈমানও বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ'। আর মুমিনের স্থান হ'ল জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের পরিচায়ক। আর দুশ্চরিত্রের স্থান জাহান্নাম' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৮৫৬, হাদীছ ছহীহ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, যার লজ্জা নেই তার ঈমান নেই। আর যার ঈমান নেই তার জান্নাত নেই। অপরদিকে যে লজ্জাহীন সে দুশ্চরিত্রের অধিকারী। দুশ্চরিত্রের অধিকারী জাহান্নামী। মূলতঃ লজ্জাশীলতা নারীর ভুষণ। লজ্জাহীনরা অধিকাংশ সময় সমাজে নিগৃহীত হয়। তাই ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের কল্যাণের জন্য সকলকে লজ্জাশীল হওয়া আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্দানশীল কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন *(রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৩৮৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লজ্জাশীলতা প্রকৃতপক্ষে নারীদের স্বভাব। অথচ বর্তমান সমাজে নারীরা বেপর্দা হয়ে নির্লজ্জভাবে চলা ফেরা করে। পাতলা রেশমী পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে পর পুরুষকে আকৃষ্ট করার হীন উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয়। তাদের পোশাকের ভিতর দিয়ে দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ দেখা যায়। ফলে যুবকরা তাদের দেখে আকৃষ্ট হয়। এর ফলেই সংঘটিত হয় ধর্ষণ, অপহরণের মত ন্যক্কারজনক ঘটনা। এ কারণে সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হয়, সমাজের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়। সমাজ হয়ে ওঠে অশান্তির অগ্নিগর্ভ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) নারীদের থেকে পুরুষদেরকে সাবধান থাকতে বলেছেন। কারণ নারীরা পুরুষদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলতে পারে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৫)*।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বাধিক ভালবাসাও পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচয়। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও সব মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় পাত্র হব' *(মুসলিম, মূল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭; বঙ্গানুবাদ বুখারী, হা/১৫ 'ঈমান' অধ্যায়)*। আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'নিশ্চয়ই যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসের আতিথেয়তা' *(কাহাফ ১০৭)*।

অন্য একটি হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যার চরিত্র উত্তম সেই পরিপূর্ণ ঈমানদার' *(আবুদাউদ, দারেমী, মিশকাত, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৭৪)*।

উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই পূর্ণ মুমিন। উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে পূর্ণ মুমিন হ'তে হ'লে সব ধরনের পাপ কাজ হ'তে বিরত থাকতে হবে। যেসব কাজ করতে মনে খটকা লাগে বা বিবেকে বাধা দেয়, তাই হচ্ছে পাপ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পূণ্য হ'ল উত্তম স্বভাব। আর পাপ হ'ল যে কাজ মনে সংশয় সৃষ্টি করে এবং যা সমাজে প্রকাশ হওয়া লজ্জাজনক মনে হয়' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৫২)*।

সুতরাং নিজেকে সব ধরনের অনৈসালামিক ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখাই হচ্ছে পূর্ণ মুমিনের পরিচয়। দ্বীনের ব্যাপারে কোন ছোট খাট বিষয় নেই। দ্বীনের সব বিধান মেনে চলাই মুমিনের কর্তব্য। কোন জিনিস থেকে কিছু বাদ দিলে যেমন সে জিনিস অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তেমনি পূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য দ্বীনের ছোট বড় সব বিধানই মেনে চলতে হবে।

ঈমানের ফলাফলঃ

আল্লাহ তা'আলার বাণী, إِلاَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٌ

'কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার' *(ত্বীন ৬)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً–

‘নিশ্চয়ই যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসের আতিথেয়তা’ *(কাহাফ ১০৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنِيْنَ ‘মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে’ *(মু’মিনূন ১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, ‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে *(বাক্বারাহ ২৫)*।

ঈমান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না’ *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৮০)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্ তা‘আলা ফেরেশতাগণকে ডেকে বলবেন, যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম হ’তে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হ’তে বের করে আনা হবে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় মুমিনদের ঈমানের কারণে

তাদের জন্য অতিব সুন্দর পুরষ্কারের ওয়াদা করেছেন। তেমনি কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاَيَتِنَا اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ–

‘আর যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করবে এবং মিথ্যারোপ করবে তারাই হল জাহান্নামী। তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে’ *(বাক্বারাহ ২৩৪)*। তিনি আরো বলেন, ‘আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কোন কাজে আসবে না। আর তারাই হবে জাহান্নামের ইন্ধন’ *(আলে ইমরান ১০)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! মানব জাতির যে কেউ হোক, ইহুদী হোক কিংবা নাছারা, যে আমার নবুওয়াতের কথা শ্রবণ করবে এবং যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি

ঈমান না এনে মারা যাবে সে নিশ্চয়ই জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

ছালাত

আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পরই তাঁর ইবাদত করা আবশ্যক হয়ে যায়। ইবাদতের মধ্যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ছালাত। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে তার ছালাতের। যার ছালাত শুদ্ধ হবে তার সকল আমলই পরিশুদ্ধ হবে। আর ছালাত বাতিল হবে তার সকল আমল বাতিল হবে' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, ত্বাবারানী, আওসাত, আলবানী সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৫৮)*। তাই ছালাত সম্পর্কে আমাদের সর্বাগ্রে জানা দরকার। নিম্নে ছালাত সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হ'ল।

ছালাতের ফরযিয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّنِيْ أَنَا اللهُ لاَإِلَهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِيْ.

'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আমার স্মরণার্থে ছালাত আদায় কর' *(ত্ব-হা ১৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَاَقِمِ الصَّلَوةَ اِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ–

'ছালাত আদায় কর। নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ১৫)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে ছালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন' *(ত্ব-হা ১৩২)*।

ছালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَوةُ فَاِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرَ عَمَلِهِ وَاِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرَ عَمَلِهِ

‘ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সর্বপ্রথম হিসাব নিবেন ছালাতের। ছালাতের হিসাব ঠিক হ’লে বাকি আমল সমূহের হিসাব ঠিক হবে। ছালাত বিনষ্ট হ’লে বাকি আমল সমূহ বিনষ্ট হবে’ *(তাবারানী, আওসাত্ব, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৬৯, ১/২২২ পৃঃ)*।

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে সবচেয়ে বেশী বার ছালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্য কোন ইবাদতের ব্যাপারে এত তাকীদ করেননি। কুরআনে অন্যূন ৮২ জায়গায় ছালাতের কথা এসেছে *(আল-মু‘জাম, বৈরুত ছাপা ১৯৮৭)*। উল্লেখ্য যে, অন্য কোন ইবাদত পালনে অপারগ হ’লে ফিদইয়া, ছদাক্বা বা কাফফারা দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু ছালাতের ব্যাপারে কোন বদলার কথা বলা হয়নি। যাদের উপর ছালাত ফরয হয়েছে তাদের জ্ঞান থাকা পর্যন্ত আজীবন ছালাত আদায় করে যেতে হবে। দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়ে সক্ষম না হ’লে বসে, বসে সক্ষম না হ’লে শুয়ে হ’লেও ছালাত আদায় করতেই হবে। কোন অবস্থায় ছালাত পরিত্যাগ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা ছালাত সম্পন্ন কর দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা শুয়ে। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবে *(নিসা ১০৩)*।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ–

ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে। যদি তাতে অসমর্থ হও তবে বসে আদায় করবে। যদি তাতেও অসমর্থ হও তবে পার্শ্বের উপর শুয়ে আদায় করবে’ *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৭৯)*।

ছালাত আদায়ের পূর্বশর্ত হচ্ছে পবিত্রতা। পবিত্র হয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব না হ’লে, মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে হবে। ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাত আদায় করতে হবে কিন্তু কোন অপরিচিত স্থানে বা সফরে থাকাবস্থায় ক্বিবলা চিনতে না পারলে অনুমান করে ক্বিবলা ঠিক করে ছালাত আদায় করতে হবে। এতে ক্বিবলা সঠিকভাবে নির্ধারিত না হ’লেও ছালাত হয়ে যাবে। ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য পরিধানের পোশাকও পবিত্র হওয়া যরূরী। যদি কারো পরিষ্কার পোশাক না থাকে তবে ঐ

অবস্থায়ই তাকে ছালাত আদায় করতে হবে। একেবারেই কারো পোশাক না থাকলেও তাকে পোশাক বিহীন অবস্থায় ছালাত আদায় করতে হবে। এক কথায় যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন সবাইকে সর্বাবস্থায় ছালাত আদায় করতে হবে। ছালাতের কোন বিকল্প নেই। এর পরিবর্তেও কোন বিধান নেই। কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে তার জন্য ঐ অবস্থায় ছালাত মাফ। কিন্তু যখন তার জ্ঞান ফিরে আসবে তখন তাকে ছালাত আদায় করতে হবে।

ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

ইসলামে ছালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরই ছালাতের স্থান বলে উল্লেখ করেছেন *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২, ঈমান অধ্যায়)*। ছালাত হচ্ছে ইসলামের মূল স্তম্ভ বা খুটি, যা ব্যতীত ইসলাম টিকে থাকতে পারে না। এ মর্মে হাদীছে এসেছে- মু'আয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দ্বীনের কাজের আসল স্তম্ভ হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামের মূল স্তম্ভ হচ্ছে ছালাত *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হ/২৯, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭)*। ইসলামে ছালাতের গুরুত্ব এত বেশী যে, সাত বৎসর বয়সেই বাচ্চাদেরকে ছালাত শিক্ষা দিতে বলা হয়েছে এবং দশ বৎসর বয়সে ছালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করতে বলা হয়েছে *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৬)*। অন্য কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। ছালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সকল ছালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও বিশেষ করে মধ্যবর্তী ছালাতের ব্যাপারে' *(বাক্বারাহ ২৩৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় থাকে তাহ'লে পথ চলা অবস্থাতেই ছালাত আদায় কর। অথবা সওয়ারীর উপরে থাকাবস্থায়' *(বাক্বারাহ ২৩৯)*। এ আয়াত দ্বারা ছালাতের সীমাহীন গুরুত্ব অনুমান করা যায়।

রাসূল ছাঃ) ছালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, 'ইসলামের প্রথম যে রশি ছিন্ন হবে, তাহল তার শাসন ব্যবস্থা এবং সর্বশেষ যে রশি ছিন্ন হবে তা হল ছালাত। আর দুনিয়া হ'তে ছালাত বিদায় নেবার পরপরই ক্বিয়ামত হবে' *(আহমাদ, ছহীহ ইবনু হিব্বান, গৃহীতঃ আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৫৬৯)*।

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদত সমূহের মধ্যে ছালাতকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করেছেন, যা অন্য কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে করেননি *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৪)*। এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ছালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'বান্দা ও কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য হল ছালাত পরিত্যাগ করা' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৩)*। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বশেষ অছিয়ত ছিল ছালাত ও নারী জাতি সম্পর্কে *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হা/১৬২৫)*।

ছালাতের ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ–

'নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ৪৫)*।

ছালাতের ফযীলতের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতের হিফাযত করল ছালাত তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন নূর, দলীল ও নাজাতের কারণ হবে' *(আহমাদ, দারেমী, মিশকাত হা/৫৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩১)*। তিনি আরো বলেন, 'যদি তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে নদী থাকে যাতে দৈনিক সে পাঁচ বার গোসল করে, তাহ'লে তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকতে পারে? ছাহাবীগণ বললেন, না তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের উদাহরণ অনুরূপ। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার গুনাহ সমূহ দূর করে দেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৯)*।

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'বান্দা যখন ছালাতে দণ্ডায়মান হয় তখন তার সমস্ত গুনাহ হাযির করা হয়। অতঃপর তার মাথায় ও দুই স্কন্ধে রেখে দেওয়া হয়। এরপর সে ব্যক্তি যখনই রুকূ, সিজদায় যায় তখনই গুনাহ সমূহ ঝরে পড়ে' *(তাবারানী, বায়হাক্বী, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, মাজমু'আ রাসাইল, রিয়ায:১৪০৫ হিঃ পৃঃ ২০২)*।

ওমর ইবনু রুআইবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এমন ব্যক্তি কখনো জাহান্নামে যাবে না যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে ছালাত আদায় করেছে' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৫)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ পর্যন্ত, এক রামাযান হ'তে অন্য রামাযান পর্যন্ত এর

মধ্যবর্তী যাবতীয় (ছগীরা) গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। যদি সে কবীরা গুনাহ সমূহ হ'তে বিরত থাকে, যা তওবা করা ব্যতীত মাফ হয় না' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৮)*।

ওবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে ছালাতের রুকন সমূহ পরিপূর্ণ করে যথাযর্থ খুশূ-খুযূ সহকারে ঠিক সময়ে আদায় করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা পালন করল না তার জন্য আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন কিংবা শাস্তি দিতে পারেন' *(আবুদাউদ, আহমাদ, মিশকাত, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৪)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, বান্দার আমল সমূহের মধ্যে ছালাতই হচ্ছে মূল। যার ছালাত ঠিক হবে তার সব আমলই সঠিক হবে। আর যার ছালাত বিনষ্ট হবে তার সব আমলই বিনষ্ট হবে। তাই আদর্শ নারীর জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া অতিব যরূরী। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী , 'যে মহিলা তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে ও স্বামীর অনুগত থাকে তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেওয়া হয়। সে যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩২৫৪)*। যেসব আমল দ্বারা নারী জাতি সহজেই জান্নাতে যেতে পারে তার একটি হচ্ছে সঠিকভাবে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা।

একনযরে ছালাতঃ

۞ ছালাত আদায় করার পরও এক শ্রেণীর মুছল্লী 'ওয়াইল' নামক জাহান্নামে যাবে *(মা'ঊন ৪-৫)*।

۞ কিছু লোক এমন আছে যারা ছালাত আদায় করে কিন্তু তাদের ছালাত মোটেও হয় না *(বঙ্গানুবাদ বুখারী, হা/১২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৪)*।

۞ এক শ্রেণীর লোক এমন আছে যারা ছালাত আদায় করে কিন্তু তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৯১)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হচ্ছে যে ছালাতের রুকূ, সিজদা ঠিকমত আদায় করে না। সে ছালাত চোর *(আহমাদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮২৫)*।

ছালাত আদায় করার পর যদি তা সিদ্ধ না হয় তাহ'লে এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হ'তে পারে। এজন্য রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী যথাযথভাবে ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা তিনি বলেছেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখেছ' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৮১)*। নিম্নে এক নযরে রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতি অনুসারে ছালাত আদায়ের নিয়ম বর্ণিত হল।

অযু করার পর অন্তরে ছালাতের নিয়ত করে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা শেষে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকের উপর বাঁধবে। এ সময় দু'হাত কনুই বরাবর অথবা কব্জি বরাবর রেখে বুকের উপর বাঁধতে হবে। অতঃপর দো'আয়ে ইস্তেফতাহ বা 'ছানা' পড়ে, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। [জেহেরী ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে সশব্দে 'আমীন' বলতে হবে। একাকী ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ শেষে প্রথম দু'রাক'আতে কুরআনের সহজসাধ্য অন্য কোন সূরা বা কিছু আয়াত তেলাওয়াত করতে হবে। মুছল্লী মুক্তাদী হ'লে জেহেরী ছালাতে চুপে চুপে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে এবং ইমামের ক্বিরআত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে যোহর ও আছর ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়তে পারে এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে।]

এরপর ক্বিরআত শেষে 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে রাফউল ইয়াদায়েন করে রুকূতে যেতে হবে। এসময় হাটুর উপরে দু'হাতে ভর দিয়ে পা, হাত, পিঠ ও মাথা সোজা করে 'সুব্হ:না রব্বিইয়াল আযীম' (পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান) যতবার সম্ভব পড়বে। তারপর রুকূ থেকে উঠে সোজা ও সুস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে দু'হাত ক্বিবলামুখী রেখে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এবং ইমাম-মুক্তাদী সকলে 'সামিআল্ল-হু লিমান হ:মিদাহ' বলে রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলবে 'রব্বানা ওয়া লাকাল হ:মদু, হ:মদান কাছীরং ত্বইয়িবাম-মুবারকাং ফীহ'। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে প্রথমে দুই হাত ও পরে দুই হাটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে এবং সিজদায় বেশী বেশী দো'আ পড়বে। সিজদার

সময় দুই হাত মাথার দু'পাশে কান অথবা কাঁধ বরাবর করে আঙ্গুল সমূহ একত্রিত করে স্বাভাবিকভাবে ক্বিবলামুখী করে রাখবে। এ সময় কনুই ও বগল ফাঁকা থাকবে। বুক হাটুর সঙ্গে চেপে রাখা যাবে না। বরং সিজদা লম্বা করে দিতে হবে যাতে পিঠ সোজা হয়ে থাকে এবং পেটের নিচ দিয়ে বকরীর বাচ্চা পার হয়ে যাওয়ার মত জায়গা ফাঁকা থাকে।

সিজদার সময় 'সুবহ:না রব্বিইয়াল আলা' (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ) যতবার সম্ভব পড়বে। রুকূ ও সিজদার জন্য আরো অন্যান্য অনেক দো'আ আছে।

প্রথম সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপর বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখতে হবে। এসময় স্থিরভাবে বসে এ দো'আ পড়তে হবে 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ার হ:মনী ওয়াজবুরনী ওয়াহ্দিনী ওয়া'আফিনী ওয়ার ঝুকনী' (হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহ:ম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন, আমাকে রুযী দান করুন। অথবা কয়েকবার 'রব্বিগফিরলী' বলবে)। তারপর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে এবং প্রথম সিজদার মত দো'আ পড়বে। তবে রুকূ ও সিজদায় কুরআনী দো'আ পড়া যাবে না। এভাবে এক রাক'আত ছালাত পূর্ণ হয়ে গেলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আত আদায় করতে হবে। তবে দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে অল্প সময় স্থির হয়ে বসে তারপর উঠে দ্বিতীয় রাক'আত শুরু করবে। এসময় কোন কিছু পড়তে হবে না। মাটিতে দু'হাতে ভর দিয়ে পরবর্তী রাকা'আতের জন্য দাঁড়াতে হবে।

তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের দ্বিতীয় রাক'আত শেষে বসে তাশাহূদ পড়ে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য উঠে দাঁড়াবে এবং ৩য় ও ৪র্থ রাকা'আত অনুরূপভাবে আদায় করবে কিন্তু সূরা ফাতিহার পর অন্য কোন সূরা বা আয়াত মিলাতে হবে না। দু'রাকা'আত বিশিষ্ট ছালাত হ'লে দু'রাক'আত শেষে বসে তাশাহুদের পর দরূদ, দো'আয়ে মাছূরা ও সম্ভব হ'লে অন্যান্য দো'আ পড়বে। এ সময় বাম পায়ের নিচ দিয়ে ডান পা বের করে দিয়ে এবং ডান পায়ের আঙ্গুল ক্বিবলামুখী রেখে নিতম্বের উপর বসবে। বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুল বাম হাটুর প্রান্ত বরাবর এবং ডান হাতের আঙ্গুল ৫৩-এর ন্যায় (ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মধ্যমা আঙ্গুল সহ) মুষ্টিবদ্ধ করবে। তর্জনী বা শাহাদত আঙ্গুল নাড়িয়ে সালামের পূর্ব পর্যন্ত ইশারা করতে থাকবে। এক্ষেত্রে মুছল্লীর নযর শাহাদত আঙ্গুলের দিকে থাকবে। অন্য সময়ে মুছল্লীর নযর সিজদার স্থানের দিকে

থাকবে। এভাবে দো'আয়ে মাছূরা শেষ করে প্রথমে ডানে ও পরে বামে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে সালাম ফিরাবে। প্রথম সালামের শেষে 'ওয়া বারাকাতুহ' যোগ করা যেতে পারে।

ছালাত শেষ করে সালাম ফিরানোর পর পরই সরবে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলে তিনবার 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলবে এবং নিম্নের দো'আ সহ অন্যান্য দো'আ পড়বে।

اَللهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা আংতাস সালামু ওয়া মিংকাসসালামু তাবারকতা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকর-ম।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আসে। বরকতময় আপনি হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক'। ইচ্ছা হ'লে এটুকু পড়েও উঠে যেতে পারে।

আযান ও আযানের দো'আ

আযান একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যারা আযান দিবে তারা ক্বিয়ামতের মাঠে সম্মানিত হবে। আযানের আওয়ায যতদূর পর্যন্ত যায় তার সবকিছুই ক্বিয়ামতের মাঠে সাক্ষ্য দিবে। আযানের শব্দগুলি নিম্নরূপ-

اللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلـهَ إِلاَّ اللّٰهُ أَشْـهَدُ أَنْ لاَّ إِلـهَ إِلاَّ اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّـدًا رَّسُـوْلُ اللّٰهِ، حَـيَّ عَلَـى الـصَّلٰوةِ حَـيَّ عَلَـى الصَّلٰوةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أكْبَرُ، لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللّٰهُ.

আযানের জওয়াব এবং আযান শেষের দো'আ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যখন তোমরা মুআযযিনের আযান শুনতে পাও, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষন করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসীলা নামক স্থানটি

চাও। কেননা উহা জান্নাতের এমন একটি স্থান, যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে একজনের জন্য নির্ধারিত। আমার ধারণা, আমিই সে ব্যক্তি। যে ব্যক্তি আমার জন্য উক্ত স্থান প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৬৫ পৃঃ হা/৬৫৭ 'আযানের ফযীলত ও মুওয়াযযিনের করণীয়' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মুআযযিন যখন 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' এবং 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলবে, তখন শ্রোতাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৬৫ হা/৬৫৮)*।

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِى وَ عَدْتَهُ–

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ ওয়াস্বলা-তিল ক্ব-য়িমাহ, আ-তি মুহ:াম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ, ওয়াব্'আছ্হু মাক্ব-মাম মাহ্:মূদানিল্লাযী ওয়া'আত্তাহ।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের তুমিই প্রভু! মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অসীলা নামক স্থান ও মর্যাদা দান কর। তুমি তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দাও, যা তাঁকে প্রদানের ওয়াদা তুমি করেছ।' তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত, হা/৬৫৯, পৃঃ ৬৫)*।

প্রকাশ থাকে যে, আযানের দো'আতে নিম্নোক্ত দু'টি বাক্য কেউ কেউ বৃদ্ধি করে থাকে। যার কোন ভিত্তি নেই। (১) وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ (২) اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

(তাহক্বীক মিশকাহ আলবানী, হা/৬৫৯ টীকা নং ২)।

সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শুনে বলবে,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَ بِالْإِسَلاَمِ دِيْنًا–

***উচ্চারণঃ** আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌:দাহূ লা- শারীকালাহূ ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহ:াম্মাদান 'আব্‌দুহূ ওয়া রসূলুহ, রয্বীতু বিল্লা-হি রব্বাঁ- ওয়া বিমুহ:াম্মাদির রসূলা-, ওয়া বিল্‌ ইস্‌লা-মি দ্বীনা- ।*

অর্থঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক হিসাবে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি' তাহ'লে তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৬৫ হা/৬৬১ 'আযানের ফযীলত ও মুওয়াযযিনের করণীয়' অনুচ্ছেদ)*।

ইক্বামতের বাক্য

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ.

***উচ্চারণঃ** আল্লা-হু আকবার আল্ল-হু আকবার, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, আশহাদু আন্না মুহ:াম্মাদার রাসূলুল্লা-হ, হ:াইয়্যা আলাছ ছলা-হ, হ:াইয়া আলাল ফালাহ: ক্বদক্বমাতিছ ছলাতু ক্বদক্বমাতিছ ছলাহ, আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ।*

ইক্বামতের জবাব

ইক্বামত দেয়ার সময় মুস্বল্লীগণ মু'য়াযযিনের সাথে সাথে ইক্বামতের শব্দগুলি বলবে। রাসূলুল্ল-হ (ছাঃ) আযান ও ইক্বামত ইভয়কেই আযান বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৮ পৃঃ; হাইয়াতু কিবারিল ওলামা ১/২৭১ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ *(ক্বাদ ক্ব-মাতিস্ব স্বলা-হ)* এর জবাবে أَقَامَهَا اللّٰهُ وأَدَامَهَا বলার হাদীছটি য'ঈফ *(যঈফ আবদাউদ হা/৫২৮; ইরওয়াউল গালীল হা/২৪১, ১/২৫৮ পৃঃ আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/ ৬৭০-এর টীকান নং১)*।

অতএব ইক্বামতের শব্দগুলির জবাবে মুছল্লীদেরও আযানের অনুরূপই বলতে হবে।

ছালাতের প্রয়োজনীয় দো‘আ সমূহ

দো‘আয়ে ইস্তেফতাহ বা ছানাঃ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بَالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَ الْبَرَدِ–

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা বা-‘ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্ব-ইয়া-ইয়া কামা বা-‘আত্তা বাইনাল মাশ্‌রিক্বি ওয়াল মাগরিব। আল্ল-হুম্মা নাক্বক্বিনী মিনাল খাত্ব-ইয়া কামা-ইউনাক্বক্বাছ ছাওবুল আব্‌ইয়াযু নিাদ দানাস। আল্ল-হুম্মাগ্‌সিল খাত্ব-ইয়া-ইয়া বিলমা-য়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারদ।*

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপ সমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেরূপ তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার পাপসমূহ হ’তে পরিচ্ছন্ন কর, যেরূপ পরিচ্ছন্ন করা হয় ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ সমূহ ধুয়ে ফেল পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭৭ হা/৮১২ ‘তাকবীরের পর কী বলবে’ অনুচ্ছেদ)।*

রুকূর দো‘আ সমূহ

(১) ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাগ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ রুকূ করবে তখন সে যেন বলে, سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْم *(সুব্‌হ:া-না রব্বিয়াল আযীম)* ‘আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি’ *(আবুদাঊদ, মিশকাত পৃঃ ৮২)।*

(২) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর রুকূ এবং সিজদায় বেশী বেশী বলতেন- سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى–

উচ্চারণঃ *সুব্‌হ:া-নাকা আল্ল-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহ;ামদিকা আল্ল-হুম মাগ্‌ফির্‌লী।*

অর্থঃ ‘হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! তোমার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে তুমি মাফ করে দাও’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮২ হা/৮৭১ ‘রুকূ’ অনুচ্ছেদ)।*

(৩) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রুকূ এবং সিজদায় বলতেনঃ

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ .

***উচ্চারণঃ** সুব্বূহুন কুদ্দূসূন রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার-রূহ: ।*

অর্থঃ '(আল্লাহ) স্বীয় সত্তায় পবিত্র এবং গুণাবলীতেও পবিত্র যিনি ফেরেশতাকুল এবং জিবরীল (আঃ)-এর প্রতিপালক' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮২ হা/৮৭২)* ।

(৪) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন রুকূ করতেন তখন বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ بِكَ اَمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَ بَصَرِىْ وَ مُخِّىْ وَ عَظْمِىْ وَ عَصَبِىْ.

***উচ্চারণঃ** আল্ল-হুম্মা লাকা রকা'তু ওয়া বিকা আ-মাংতু ওয়া লাকা আসলামতু খশা'আলাকা সাম'ঈ ওয়া বাস্বরী ওয়া মুখখী ওয়া 'আয:মী, ওয়া 'আস্ববী ।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকূ করছি, একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি। একমাত্র তোমার কাছেই আত্মসমর্পন করেছি। আমার কর্ণ, চোখ, মস্তিষ্ক, হাড় স্নায়ূ তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭৭ হা/৮১৩ 'তাকবীরে তাহরীমার পরে কী বলবে' অনুচ্ছেদ ।)* ।

(৫) আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রুকূ এবং সিজদায় বলতেন, سُبْحَنَكَ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ *(সুব্হ:া-নাক ওয়া বিহ:াম্‌দিকা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা)*। 'তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি। তোমার নিকট ক্ষমা চাই, তোমার নিকট তাওবা *করি' (সিলসিলা ছহীহা হা/৬৬৯)* ।

রুকূ হ'তে উঠার দো'আ

রুকূ হ'তে উঠার সময় বলতে হয় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ–

উচ্চারণঃ 'সামি'আল্ল-হু লিমান হ:ামিদাহ'। অর্থঃ আল্লাহ শোনেন তার কথা যে তাঁর প্রশংসা করে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ইমাম 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলবে, তখন তোমরা বলবে, اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ *(আল্ল-হুম্মা রব্বানা- লাকাল হ:াম্দ)* 'হে আল্ল-হ! যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তোমারই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮২)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন রুকূ হ'তে মাথা উঠাতেন, তখন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّموَاتِ وَ مِلْأَ الْأَرْضِ وَ مِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَ كُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَ لاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা রব্বানা- লাকাল হ:াম্দু মিল্আস সামা-ওয়া-তি ওয়া মিল্আল আরয্বি ওয়া মিল্আ মা- শি'তা মিং শাইয়িম বা'দু আহ্লাছ ছানা-য়ি ওয়াল মাজ্দি আহ:াক্কু মা-ক্ব-লাল 'আবদু ওয়া কুল্লুনা- লাকা 'আবদুন, আল্ল-হুম্মা লা- মা-নি'আ লিমা- আ'ত্বইতা ওয়ালা- মু'ত্বিয়া লিমা- মানা'তা ওয়ালা- ইয়ান্ফায়ু যাল জাদ্দি মিংকাল জাদ্দ।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তোমারই প্রশংসা যা আসমান পরিপূর্ণ, যমীন পরিপূর্ণ এবং তুমি যা চাও তা পরিপূর্ণ। হে প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী। মানুষ যা (তোমার প্রশংসায়) বলে তুমি তার চেয়ে অধিক উপযোগী। আমরা সকলেই তোমার দাস। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান করবে, তাতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। আর তুমি যাতে বাধা প্রদান করবে, তা প্রদানের কেউ নেই। কোন সম্পদশালীর সম্পদ তোমার শাস্তি হ'তে রক্ষা করতে পারবে না। সে সম্পদও তোমার নিকট থেকে প্রাপ্ত' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮২)*।

সিজদার দো'আ

(১) سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلَى *(সুব্হ:া-না রব্বিয়াল আ'লা)* (*তিরমিযী, মিশকাত, পৃঃ ৮৩ সনদ হাসান*)।

(২) سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

(সুব্হ:া-নাকা আল্লা-হুম্মা রব্বানা-ওয়া বিহ:াম্দিকা আল্লা-হুম মাগ্ফির্লী)

(৩) سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَ الرُّوْحِ *(সুব্বূহ:ন কুদ্দূসুন রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার-রূহ:)*

(৪) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সিজদায় বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ أَمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَ جْهِىَ لِلَّذِى خَلَقَهُ وَ صَوَّرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ–

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা লাকা সাজাদ্তু ও বিকা আ-মাংতু ওয়া লাকা আস্লামতু সাজাদা ওয়াজ্হিয়া লিল্লা-যী খালাক্বাহূ ওয়া স্বওওয়ারাহূ ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়া বাস্বরহূ তাবা-রকাল্ল-হু আহ:সানুল খ-লিক্বীন।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সিজদা করছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার জন্য নিজেকে সপে দিয়েছি। আমার মুখমণ্ডল সিজদায় অবনত হয়েছে সেই সত্তার জন্য, যিনি উহাকে সৃষ্টি করেছেন, উহার আকৃতি দান করেছেন এবং উহার কান ও চোখ খুলে দিয়েছেন। মঙ্গলময় আল্লাহ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭৭, হা/৮১৩)*।

(৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সিজদায় বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجُلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ وَ عَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ–

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মাগ্ফির্লী যাম্বী কুল্লাহূ দিক্কাহূ ওয়া জিল্লাহূ ওয়া আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ ওয়া 'আলা-নিয়্যাতাহূ ওয়া সির্রাহ।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ছোট-বড়, পূর্বের-পরের এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭৭, হা/৮৯২)*।

(৬) আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক রাতে আমি রাসূল (ছাৎ) -কে বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। আমার হাত তাঁর পায়ের তলাতে ঠেকল। তখন তিনি মসজিদে উভয় পায়ের পাতা খাড়া অবস্থায় সিজদায় ছিলেন। তখন তিনি বলছিলেনঃ

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَاتِكَ وَ بِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ–

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিয-কা মিন সাখত্বিকা ওয়াবি মু'আ-ফাতিকা মিন 'উকূবাতিক, ওয়া আ'উযুবিকা মিংকা লা-উহ্:স্বী ছানা-আন 'আলাইকা আংতা কামা- আছ্নাইতা 'আলা-নাফ্সিক।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি হ'তে আশ্রয় চাই। আর তোমার শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাই। তোমার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য যেরূপ তুমি নিজেই করেছ' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭৮)*।

দুই সাজদার মাঝের দো'আঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ ارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِيْ وَ اهْدِنِىْ وَ عَافِنِىْ وَ ارْزُقْنِىْ–

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম মাগ্ফির্লী ওয়ার্হ:মনী ওয়াজ্বুরনী ওয়াহ্দিনী ওয়া 'আ-ফিনী ওয়ার্ঝুক্বনী।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহমত করুন, আমার অবস্থা সংশোধন করুন, আমাকে সৎ পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭৭, হা/৮৯৩)*।

তাশাহ্হুদঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ–

উচ্চারণঃ *আত্তাহি:ইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াস স্বলাওয়া-তু ওয়াত্ব-ত্বইয়িবা-তু আস-সালা-মু 'আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়ু ওয়া রহ:মাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহ, আস্সালা-মু 'আলাইনা- ওয়া 'আলা-'ইবা-দিল্লা-হিস স্ব-লিহীন আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহ:াম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রসূলুহ।*

অর্থঃ 'মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্ত ইবাদত আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ নেক বান্দাদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইবাদতের যোগ্য আর কোন মা'বূদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল' *(বুখারী, মিশকাত, পৃঃ ৮৫)*।

দরূদঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা স্বল্লি ‘আলা-মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা-আ-লি মুহাম্মাদ কামা-স্বল্লাইতা ‘আলা- ইব্‌রা-হীম, ওয়া ‘আলা- আ-লি ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হ:ামীদুম মাজীদ, আল্ল-হুম্মা বা-রিক ‘আলা-মুহ:াম্মদ, ওয়া ‘আলা-আ-লি মুহ:াম্মাদ কামা-বা-রকতা ‘আলা ইব্‌র-হীম, ওয়া ‘আলা- আ-লি ইব্‌র-হীম, ইন্নাকা হ:ামীদুম মাজীদ।*

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত অবতীর্ণ কর মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত’ (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮৬, হা/৯১৯*)।

দো‘আয়ে মাছূরাঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

উচ্চারণঃ আল্ল-হুম্মা ইন্নী য:লামতু নাফসী যু:লমান কাছীরা-, ওয়ালা-ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা- আংতা ফাগ্‌ফির্‌লী মাগ্‌ফিরাতাম মিন্‌ ‘ইন্‌দিকা ওয়ার্‌হ:ামনী ইন্নাকা আংতাল গফূরুর রহ:ীম।

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! আমি আমার উপর অসংখ্য অন্যায় করেছি এবং তুমি ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার কেউ নেই। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা

একমাত্র তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আমার প্রতি রহমত কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮৭, হা/৯৩৯*)।

দাজ্জাল থেকে পরিত্রাণ চেয়ে দো'আঃ দো'আয়ে মাছূরার সাথে নিম্নের দো'আটি যোগ করার জন্য হাদীছে বিশেষভাবে তাকীদ এসেছে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ أعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ- اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَ مِنَ الْمَغْرَمِ-

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বি জাহান্নাম ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্বর, ওয়া আ'উযুবিকা মিং ফিতনাতিল মাসীহি:দ দাজজা-ল, ওয়া আ'উযুবিকা মিং ফিত্নাতিল মাহ্:ইয়া- ওয়াল মামা-ত, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ মা'ছামি ওয়া মিনাল মাগ্রম।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের আযাব হ'তে আশ্রয় চাচ্ছি, কবরের আযাব হ'তে আশ্রয় চাচ্ছি, আশ্রয় চাচ্ছি কানা দাজ্জালের পরীক্ষা হ'তে। তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হ'তে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি পাপ ও ঋণের বোঝা হ'তে' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮৭*)।

সালাম ফিরানোর পরের দো'আ সমূহঃ

اللهُ اَكْبَرُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ

উচ্চারণঃ *আল্ল-হু আকবার* (একবার) *আস্তাগ্ফিরুল্ল-হ, আস্তাগ্ফিরুল্ল-হ, আস্তাগ্ফিরুল্ল-হ (তিনবার)।*

অর্থঃ আল্লাহ মহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

অতঃপর – اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা আংতাস সালা-মু ওয়া মিংকাস সালা-মু তাবা-রাক্তা ইয়া-যাল্ জালা-লি ওয়াল্ ইকরা-ম।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়। তোমার নিকট থেকেই শান্তির আগমন। তুমি বরকতময়, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী!' (*মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮৮*)।

তারপর-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ, اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَ لاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

উচ্চারণঃ *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌:দাহূ লা- শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হ:াম্‌দু ওয়া হুয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর, আল্ল-হুম্মা লা- মা-নি‘আ লিমা- আ‘ত্বাইতা ওয়ালা- মু‘ত্বিয়া লিমা- মানা‘তা ওয়ালা- ইয়াংফাউ যাল জাদ্দি মিংকাল জাদ্দ।*

অর্থঃ ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদানের ইচ্ছা কর, তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না এবং তুমি যাতে বাধা দাও, তা কেউ প্রদান করতে পারে না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমার নিকট তাকে রক্ষা করতে পারে না’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৮৮)*।

অতঃপর- اللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা আ‘ইন্নী ‘আলা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবা-দাতিকা।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য

করুন *(আহ্‌মাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৪৯, বাংলা মিশকাত হা৮৮৮)।*

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিনাল বুখ্‌লি ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিন আরযালিল ‘ওমুরি ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিং ফিৎনাতিদ দুনইয়া ওয়া ‘আযা-বিল ক্বাব্‌রি।*

অর্থঃ হে আল্লাহ আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা হ’তে, কৃপণতা হ’তে, অতি বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া হ’তে। আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হ’তে ও কবরের আযাব হ’তে *(বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৪)*। তারপর-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه–

***উচ্চারণঃ** সুব্‌হ:া-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী ‘আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিয়া নাফ্‌সিহী ওয়া যিনাতা ‘আর্‌শিহী ওয়া মিদা-দা কালেমা-তিহী।*

অর্থঃ আমি আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব প্রশংসা জ্ঞাপন করছি তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সমতুল্য এবং তাঁর আরশের ওযন ও কালেমা সমূহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০১)।*

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا–

***উচ্চারণঃ** রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাওঁ ওয়া বিল ইস্‌লা-মি দ্বীনাওঁ ওয়া বিমুহ:াম্মাাদিন্‌ নাবিইয়া* (৩ বার)।

অর্থঃ আমি সন্তুষ্ট হ’য়ে গেলাম আল্লাহ্‌র উপরে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের উপরে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদের উপরে নবী হিসাবে *(আহ্‌মাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৯৯)।*

اللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ–

***উচ্চারণঃ** আল্ল-হুম্মা আজির্‌নী মিনান্‌ না-রি* (৭ বার)।

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ্‌ তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর!’ *(আহ্‌মাদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, তানক্বীহ শরহে মিশকাত ২/৯৩, সনদে কোন দোষ নেই)।*

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ *(লা-হাওলা ওয়ালা ক্বওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি।)*

অর্থঃ ‘নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০২)।*

سُبْحَانَ اللهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَـهُ الْحَمْـدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

***উচ্চারণঃ** সুব্‌হ:ানাল্ল-হ* (৩৩ বার) *আলহ:ামদু লিল্লাহি* (৩৩ বার) *আল্ল-হু আকবার* (৩৩ বার) *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌:দাহূ লা- শারীকা লাহু লাহুল্‌ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্‌ হ:াম্‌দু ওয়া হুয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর*। একবার।

অর্থঃ 'পরম পবিত্র আল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ মহান। আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(মুসলিম, ১ম খণ্ড, হা/৪১৮; মিশকাত হা/৯৬৬-৯৬৭)*।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِه وَسُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ–

উচ্চারণঃ *সুব্হ:া-নাল্ল-হি ওয়া বিহ:াম্দিহী ওয়া সুব্হা-নাল্ল-হিল 'আয:ীম।*

অর্থঃ 'পবিত্রতা ও প্রশংসাময় আল্লাহ্ এবং মহান আল্লাহ পবিত্রতাময়'।

অথবা সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে "সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্দিহী" পড়বে। এই দু'আ পাঠের ফলে তার সকল গোনাহ্ ঝরে যাবে। যদি ও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ্, মিশকাত হা/২২৯৬-৯৮)*।

আয়াতুল কুরসীঃ

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ لَه مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيْ الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِإِذْنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِه اِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلاَ يَؤُدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ–

আ-য়া-তুল কুরসীঃ *আল্ল-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হ:াইয়ুল ক্বাইয়ূম। লা-তা'-খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূমা ফিস্সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরযি। মাংযাল্লাযী ইয়াশ্ফা'উ ইংদাহূ ইল্লা বিইয্নিহী, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়া মা-খাল্ফাহুম ওয়ালা-ইউহ:ীতূনা বিশাইয়িম্ মিন 'ইলমিহী ইল্লা-বিমা শা-আ ওয়াসি'আ কুর্সিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা, ওয়ালা-ইয়াউদুহূ হি:ফ্যুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিইয়ুল 'আয:ীম (বাক্বারাহ ২৫৫)।*

অর্থঃ আল্লাহ্ তিনি, যিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। কোন রূপ তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুপারিশ করতে পারে? তাঁদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ব করতে

পারে না, কেবল যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। আর সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত *(নাসাঈ)*। শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে *(বুখারী)*।

اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ–

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মাক্‌ফিনী বিহ:ালা-লিকা 'আন হ:ারা-মিকা ওয়া আগ্‌নিনী বিফায্‌লিকা আম্মাং সিওয়া-কা।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের হ'তে মুখাপেক্ষীহীন করুন! রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন *(তিরমিযী, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৪৪৯)*।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ–

উচ্চারণঃ *আস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হ:াইয়ুল ক্বাইয়ূম ওয়া আতূবু ইলাইহি।*

অর্থঃ 'আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আমি তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তাওবা করছি'।

এই দু'আ পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক আসামী হয়। রাসূল (ছাঃ) দৈনিক ১০০ বার তাওবা করতেন *(মুসলিম, ছহীহ তিরমিযী, হা/২৮৩১;মিশকাত হা/২৩২৫)*।

ছালাতে নারী-পুরুষের পার্থক্যঃ

নারী-পুরুষের ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَلُّوا كَمَا رَاَيْتُمُوانِيْ اُصَلِّيْ

'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখ ঠিক সেভাবেই ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৮১)*। যদি নারী-পুরষের ছালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত তাহ'লে তিনি সবার জন্য এভাবে একই নির্দেশ দিতেন না। তবে হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ হ'তে নারী-পুরষের ছালাতে যেসব ব্যতিক্রম পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপঃ

(১) জামা'আতে ছালাত আদায় করার ক্ষেত্রে পুরুষদের জামা'আতে ইমাম কাতারের সামনে একাকী দাঁড়াবেন। আর মহিলাদের জামা'আতে মহিলা ইমাম প্রথম কাতারের মাঝে দাঁড়াবে, একাকী নয় *(আবুদাউদ, দারাকুতনী, ইরওয়া হা/৪৯৩)*।

(২) ইমাম ছালাতের মধ্যে ভুল করলে, ভুল সংশোধনের জন্য পুরুষ মুক্তাদীগণ 'সুবহ:নাল্লা-হ' বলবে। আর মহিলা জামা'আতে মুক্তাদীগণ ডান হাত দ্বারা বাম হাতে মেরে আওয়াজ করবে *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১২০৩)*।

(৩) ছালাতের মধ্যে পুরুষের মাথা ঢাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মহিলাদের মাথা না ঢাকলে ছালাত কবুল হবে না (*বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৩৫২; আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৯৬)*।

(৪) মহিলারা পুরুষদের জামা'আতে ইমামতি করতে পারবে না। কিন্তু পুরুষরা নারী-পুরুষ সকলের জামা'আতে ইমামতি করতে পারবে।

(৫) পুরুষদের জামা'আতে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে মহিলা একজন হ'লেও পুরুষদের পিছনে ভিন্ন কাতারে দাড়াতে হবে (*বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৭২৭)*।

(৬) ছালাতের মধ্যে মহিলাদেরকে পায়ের গোড়ালী ঢেকে রাখতে হবে। কিন্তু পুরুষদের কাপড় থাকবে টাখনুর উপর পর্যন্ত *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৩৪)*।

কেবল ছালাতেই নয়, অন্য কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই। যারা পার্থক্য করেন তারা নিজেদের মনগড়া ভাবে এটা করে থাকেন।

ছালাতে নারীর পোষাকঃ

আদর্শ মহিলারা যখন বাড়িতে অবস্থান করে তখন সাধারণ পোষাকে থাকে। আর যখন বাড়ী থেকে বের হয় তখন তারা তাদের সমস্ত শরীর সুন্দর করে ঢেকে বের হয়। অনুরূপভাবে যখন তারা ছালাত আদায় করে তখনও সুন্দরভাবে তার মাথা হ'তে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে ছালাত আদায় করবে *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৩৭২)*। তবে ছালাতের মধ্যে চেহারা ঢাকা হাত মোযা, পা মোযা পরার প্রয়োজন নেই।

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তাঁর গোলাম নাফি'কে খালি মাথায় ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন তুমি কি লোকের নিকট গেলে এ অবস্থায় যেতে? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহই সৌন্দর্য মণ্ডিত হওয়ার ব্যাপারে বেশী হকদার *(বায়হাক্বী, আবুদাউদ)*। অন্য বর্ণনায় আছে, লোকদের

তুলনায় আল্লাহই লজ্জার ব্যাপারে অধিক হকদার *(আবুদাউদ, হাদীছ হাসান)*।

ছালাতের বাইরে পর্দার ব্যাপারে আল্লাহ অধিক হকদার হ'লে শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাতের ক্ষেত্রে তিনি আরো অধিক হকদার হবেন।

আল্লাহর বাণী, 'প্রত্যেক মসজিদে তোমরা তোমাদের সুন্দর পোষাক গ্রহণ কর' *(আ'রাফ ৩১)*। উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছালাতের জন্য পোষাক সুন্দর হওয়া যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন প্রাপ্তবয়স্কা নারীর ছালাত চাদর ব্যতীত কবুল হয় না' *(আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৯৬)*।

অতএব ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের পরিহিত সাধারণ পোষাকে যদি পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে যায়, তাহ'লে তার মাথা ঢাকার জন্য এমন একটি চাদর ব্যাবহার করতে হবে যাতে তার মাথা এমনভাবে ডেকে যায় যে কপালের সমস্ত চুল, কান ইত্যাদি আবৃত হয় ও শুধু মুখমণ্ডল বের হয়ে থাকে। রফউল ইয়াদাইনের সময়ও যাতে বুক বা অন্য কোন অঙ্গ দেখা না যায়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত আদায় করতেন আর আমি তাঁর সাথে অনেক মুমিনা মহিলাকে চাদর দিয়ে গা ঢেকে ছালাতের জামা'আতে শরীক হ'তে দেখেছি। ছালাত আদায় শেষে তারা নিজ নিজ বাড়ী ফিরে যেত। তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৩৭২)*।

ছালাতে পর্দা করার জন্য ব্যবহৃত চাদর সাদা রঙের হওয়াই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট সাদা রং ছিল প্রিয় *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৭ পৃঃ)*। ছালাতের সময় পুরুষদের কাঁধ খোলা রাখা নিষেধ।

বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) ওযূর পর ছালাতের জন্য নিয়ত করতে হবে। (২) নিয়ত কোন ভাষায় মুখে উচ্চারণ করে পড়তে বা বলতে হবে না বরং মনে মনে কল্পনা করতে হবে। (৩) ছালাত সাধ্যানুসারে আদায় করতে হবে। দাড়িয়ে না পারলে বসে, বসে আদায় করতে না পারলে শুয়ে শুয়ে আদায় করতে হবে। (৪) ছালাতের মধ্যে দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে রাখতে হবে। (৫) ছালাতের মধ্যে বৈঠকের সময় দৃষ্টি ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুলের দিকে থাকবে। (৬) ছালাতের মধ্যে কোন কিছুর জন্য ইশারা করা যায়। (৭) ছালাতের মধ্যে থুথু ডান দিকে এবং সামনে ফেলা যাবে না। (৮) ছালাতের মধ্যে থুথু ফেলার প্রয়োজন হ'লে বাম হতের তালুতে কিংবা রুমালের মধ্যে নতুবা বাম হাতের তালুতে নিয়ে বাম পায়ের গোড়ালীতে মুছে ফেলতে হবে। (৯) ছালাতের মধ্যে উচ্চস্বরে হাসা যাবে না। তবে মুচকি হাসি আসলে কোন দোষ নেই। (১০) ছালাতের মধ্যে ২য় কিংবা ৩য় রাক'আতে দাড়ানোর জন্য দুই হাত মাটিতে ভর করে দাড়াতে হবে। (১১) পুরুষের পোশাক টাখনুর উপরে এবং মহিলাদের পোশাক পায়ের পাতা পর্যন্ত হ'তে হবে। (১২) যদি ছালাতের মধ্যে কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহ'লে পুরুষরা সুবহানাল্লাহ বলবে এবং মহিলারা ডান হাত দিয়ে বাম হাতের পিঠের উপরে সজোরে আঘাত করে হাত তালি দেয়ার মত শব্দ করবে। (১৩) ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে আল-হামদুলিল্লাহ বলা যাবে কিন্তু কারো হাঁচির জবাব দেওয়া যাবে না। (১৪) ছালাতের মধ্যে সালামের জবাব দেওয়া যাবে না। তবে হাতের আঙ্গুলের ইশারায় সালামের জবাব দেওয়া যাবে। (১৫) সালামের মধ্যে কোমরে হাত রাখা যাবে না। তেমনি এক পায়ের উপর ভর করে অমনোযোগী হয়ে দাড়ানো যাবে না।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সুন্নাতী ক্বিরাআত

সূরা ফাতিহা পাঠের পর ছালাতে অন্য ক্বিরাআত হিসাবে কুরআনের যে কোন সূরা বা আয়াত যেটা সহজ তা পাঠ করা যায়। আল্লাহ বলেন,

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

'অতঃপর তোমরা পাঠ কর কুরআন থেকে যা সহজ মনে কর' *(মুযযাম্মিল ২০)*।

রাসূল (ছাঃ) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূরা বা আয়াত পাঠ করেছেন, যেগুলি আমাদের জন্য পাঠ করা সুন্নাত। বিভিন্ন হাদীছে সেসব আয়াত ও সূরা উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক বিভিন্ন ছালাতে পঠিত ক্বিরআত উল্লেখ করা হ'ল।-

ফজর ছালাতের ক্বিরাআতঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিন ফজর ছালাতের প্রথম রাক'আতে 'হাল আতা আলাল ইনসানি (সূরা আদ-দাহর) পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৮০)*। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) ফজর ছালাতে সূরা তাকবীর পড়তেন *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৭৮)*। অন্য হাদীছে আরো আছে, ফজর ছালাতে রাসূল (ছাঃ) সূরা তূর, সূরা মুমিনূন, সূরা ক্বাফ ও অনুরূপ সূরা সমূহ পাঠ করতেন *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৭৭; বঙ্গানুবাদ হা/৭৭৩-৭৭৪)*। সফরে থাকা কালীন রাসূল (ছাঃ) ফজর ছালাতে 'নাস' এবং 'ফালাক্ব' পড়তেন *(আবুদাউদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৯০)*। আরো উল্লেখ্য যে, ফজরের সুন্নাত ছালাতের দু'রাক'আতেই যথাক্রমে সূরা 'ইখলাছ' ও 'কাফিরূণ' পড়তেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে ফজরের সুন্নাত ছালাতে সূরা বাক্বারার ১৩৬ নং আয়াত থেকে পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াত থেকে পড়তেন *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৮৪-৭৮৫)*। এক বর্ণনায় আছে রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাতে দু'রাক'আতে সূরা 'ঝিলঝাল' পড়তেন *(আবুদাউদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮০২)*।

যোহর ও আছর ছালাতের ক্বিরাআতঃ

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যোহর ও আছর ছালাতে সূরা 'লাইল' এবং 'আলা' পড়তেন এবং আছরের ছালাতেও অনুরূপ সূরা পড়তেন *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৭২)*। আবার কোন কোন সময় সূরা 'বুরূজ' ও 'ত্বরিক' পড়তেন *(যাদুল মা'আদ, হাদীছ ছহীহ, পৃঃ ২০৩)*। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) যোহর ছালাতে সূরা সাজদার মত লম্বা ক্বিরাআত পড়তেন *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৭১)*।

কিন্তু রাসূল (ছাঃ) যখন যোহর ছালাতে ক্বিরাআত দীর্ঘ করতেন তখন আছরের ছালাতেও তাই করতেন। আর যখন যোহর ছালাতে ক্বিরাআত সংক্ষিপ্ত করতেন তখন আছর ছালাতেও ক্বিরাআত সংক্ষিপ্ত করতেন *(যাদুল মা'আদ পৃঃ ২০৩)*।

মাগরিব ছালাতের ক্বিরাআতঃ

জুবাইর ইবনু মুতইম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে মাগরিব ছালাতে সূরা তুর পড়তে শুনেছি *(বঙ্গানুবাদ বুখারী, হা/৭৬৫)*। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) মাগরিব ছালাতে সূরা মুরসলাত পড়তেন *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৭৬৩)*। তিনি মাগরিবের ছালাতে কোন কোন সময় সূরা ছফফাত, আদ-দুখান, সূরা আলা, ত্বীন, নাস, ফালাক্ব, পড়তেন। কোন সময় তিনি কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরা দুইটি এবং কোন সময় কেসারে মুফাছছাল অর্থাৎ বাইয়্যেনাহ হ'তে নাস পর্যন্ত সূরাগুলি পড়তেন *(যাদুল মা'আদ পৃঃ ২০৪)*।

এশার ছালাতের ক্বিরাআতঃ

বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাতে সূরা ত্বীন এবং ইনশিক্বাক্ব পড়তেন *(বঙ্গানুবাদ বুখারী, হা/৭৬৬-৭৬৭)*। একদা মুআ'য ইবনু জাবাল (রাঃ) এশার ছালাতে সূরা 'বাক্বারাহ' পড়ায় একজন ছাহাবী বিরক্ত হয়ে ছালাত ছেড়ে দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট দীর্ঘ ক্বিরাআতের অভিযোগ করলে রাসূল (ছাঃ) মু'আযকে বললেন, তুমি কি মানুষকে ফিতনায় ফেলবে? তুমি এশার ছালাতে সূরা আশ-শামস, সূরা যুহা, আল-লাইল, আলা পড়বে *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৭৫)*।

জুম'আর দিন ফজর ছালাতে বিশেষ ক্বিরাআতঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিন ফজর ছালাতে প্রথম রাক'আতে সূরা 'সাজদা' এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা 'আদ-দাহ্র' পড়তেন *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৮০)*।

দুই ঈদ ও জুম'আর ছালাতের ক্বিরাআতঃ

ওবাইদুল্লাহ ইবনু আবু রাফে (রাঃ) বলেন, একবার মারওয়ান আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে রেখে মক্কায় গেলেন। এসময় আবু হুরায়রা (রাঃ) জুম'আর ছালাতে আমাদের ইমামতি করলেন। তখন তার প্রথম রাক'আতে সূরা জুম'আ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা মুনাফিকূন পড়লেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে জুম'আর ছালাতে এদু'টি সূরা পড়তে শুনেছি *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৮১)*।

নু‘মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) দুই ঈদে ও জুম‘আর ছালাতে সূরা আলা এবং গাশিয়া পড়তেন। আর ঈদ ও জুম‘আ যখন একই দিনে হত তখন তিনি এ দু’টি সূরা উভয় ছালাতেই পড়তেন *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৮২)*। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) উভয় ঈদে সূরা ক্বাফ এবং ইক্বতারাবাতিস সাআতু পড়তেন *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ ৭৮৩)*।

ছালাতে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য ক্বিরাআতঃ

ছালাতে দো‘আয়ে ইস্তিফতাহ পাঠ শেষে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ নীরবে পড়বে। প্রকাশ থাকে যে, আউযুবিল্লাহ শুধু প্রথম রাক‘আতে পড়তে হবে। পরবর্তী রাক‘আতগুলিতে পড়ার প্রয়োজন নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯ পৃঃ; নায়ল ৩/১৯)*। ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সর্ব প্রকার ছালাতে প্রতি রাক‘আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৬৫)*। অতঃপর ৩/৪রাক‘আত বিশিষ্ট ছালাতের প্রথম দুই রাক‘আতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর অন্য যে কোন সূরা বা কুরআন হ’তে যে কোন আয়াত পাঠ করতে হবে *(মুযযাম্মিল ২০)*। মুছল্লী মুক্তাদী হ’লে জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর ইমামের কিরাআত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে *(আরাফ ২০৪)*। তবে যোহর ও আছর ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষ দু’রাকা‘আতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবে *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৭৭৬)*।

নফল ছালাতঃ

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সাথে আরো কিছু ছালাত রয়েছে যার গুরুত্ব অপরিসীম। যা আমাদের দেশে সুন্নাত ও নফল নামে পরিচিত। আসলে সমস্ত সুন্নাতগুলিই হচ্ছে নফল। মূলতঃ ফরয বাদে সকল ছালাতই নফল। সুন্নাত ও নফলের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে নফল ছালাতের মধ্যে এমন কিছু ছালাত আছে যার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কোন তাকীদ করেননি। আবার এমন কিছু ছালাত আছে যার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বিশেষভাবে তাকীদ করেছেন। সফর অবস্থায়ও রাসূল (ছাঃ) সেগুলি আদায় করেছেন এবং ছুটে গেলেও তার কাযা আদায় করেছেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নফল ছালাত সমূহের মধ্যে কোন ছালাতের প্রতি এত অধিক লক্ষ্য রাখতেন না, যত লক্ষ্য রাখতেন ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত নফলের প্রতি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৫)*।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ফজরের দুই রাক'আত ছালাত দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিস অপেক্ষা উত্তম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৯৬)*।

عن ام حبيبة قالت قال رسول الله ﷺ مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكَعَةً بُنَيَ لَهُ بَيْتٌ فِيْ الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَوةِ الْفَجْرِ.

উম্মু হাবীবা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিনে এবং রাতে বার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। (উক্ত নফল ছালাতগুলি হচ্ছে) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত। মাগরিবের পরে দুই রাক'আত এবং এশার পরে দুই রাক'আত ও ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত *(তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ ১০৯১)*।

عن ام حبيبة قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ حَافَظَ عَلَى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ-

উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাতের হিফাযত করল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৯)*।

عن ابن عمر رضـ قال قال رسول الله ﷺ رَحِمَ اللهُ اِمْرًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا-

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করবেন'। অন্য এক বর্ণনায় আছরের পূর্বে দুই রাক'আত ছালাতের কথাও আছে *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত)*।

উল্লিখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত, যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত, আছরের পূর্বে চার রাক'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক'আত এবং এশার পরে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাত বা নফল। উক্ত নফল ছালাতগুলো রাসূল (ছাঃ) নিজে আদায় করেছেন এবং ছাহাবীগণকে আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এগুলি ব্যতীত মাগরিবের পরে যে ছয় রাক'আত বা বিশ রাক'আত ছালাত আদায়ের কথা বলা হয়, তা ভিত্তিহীন। তবে মাগরিবের ফরযের পূর্বে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা যায় *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৮৪)*। ফরয ও নফল ছালাতের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে পার্থক্য করা এবং চার রাক'আত বিশিষ্ট নফল ছালাতগুলি দুই সালামে পড়াই সুন্নাত।

উপরোক্ত নফল ছালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রত্যেক আদর্শ নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য।

বিভিন্ন ছালাতের পরিচয়

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নফল ছালাত ছাড়া আরো কিছু ছালাত রয়েছে, যেগুলির ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। ছালাতগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হ'ল।-

জুম'আর ছালাতঃ

১ম হিজরীতে মদীনায় হিজরতের সময় কূবা ও মদীনার মধ্যবর্তী বনু সালেম গোত্রে সর্বপ্রথম রাসূল (ছাঃ) জুম'আর ছালাত আদায় করেন *(মির'আত ২/২৮৮)*। শহরে হোক কিংবা গ্রামে হোক প্রত্যেক জ্ঞানবান বয়স্ক মুসলমানের উপর জুম'আর ছালাত আদায় করা ফরয *(জুম'আ ৯)*। গোলাম, রোগী, মুসাফির, শিশু ও মহিলাদের উপর জুম'আ ফরয নয়। তবে মহিলাগণ জুম'আর ছালাতে উপস্থিত হ'লে তাদেরকে বারণ করা যাবে না *(মুসলিম হা/১০৫৯; আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৩৭৭; বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৯০০)*।

জুম'আর ফযীলতঃ

জুম'আর দিন অতি মহিমান্বিত দিন। এ মর্মে নিচের হাদীছটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

عن أبي هريرة رضـ قال قال رسول الله ﷺ نَحْنُ الآخِـرُوْنَ الـسَّابِقُوْنَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ اُوْتُـوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَـذَا الْيَـوْمُ الَّـذِيْ اخْتَلَفُـوْا فِيْـهِ فَهَـدَانَا اللهُ وَالنَّـاسُ لَنَافِيْهِ تَبِعَ وَالْيَهُوْدَ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমরা দুনিয়ায় আগমনের দিক দিয়ে সর্বশেষ। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবার পূর্বে। তবে তাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের পরে। অতঃপর এই দিন (শুক্রবার) সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এই শুক্রবার সম্পর্কে হিদায়াত দান করেছেন। পরের দিন ইয়াহুদীদের, তার পরের দিন নাছারাদের' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৪৫; বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৮৯৬)*। মহান আল্লাহ এই দিনে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং এই দিনে তিনি দুনিয়া ধ্বংস করবেন। এই দিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআন এই দিনে অবতীর্ণ হয়। তাই এই দিনটি অতি সম্মানিত। এ দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে সময়ে বান্দা তার প্রতিপালকের নিকট কিছু চাইলে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। অর্থাৎ তা দান করেন। অতএব জুম'আর দিন দো'আ, দরূদ, তাসবীহ, তেলাওয়াত ও ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া উচিত *(যাদুল মা'আদ ১/৩৮৬)*। এ দিন খত্বীব স্বীয় খুৎবায় এবং ইমাম ও মুক্তাদীগণ সিজদায় ও শেষ বৈঠকে তাশাহুদ ও দরূদের পর সালামের পূর্বে আল্লাহর নিকট প্রাণ খুলে দো'আ করবেন। কেননা রাসুল (ছাঃ) এ সময় বেশী বেশী দো'আ করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪)*।

عن أبي بردة بن أبي موسى قَالَ سَـمِعْتُ اَبِـيْ يَقُـوْلُ سَـمِعْتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ يَقُـوْلُ شَـاْنُ سَاعَةِ الْجُمْعَةِ هِيَ مَا بَيْنَ اَنْ يَّجْلِسَ الإمَام إِلَى اَنْ تَقْضِيَ الصَّلَوةَ–

আবু বুরদা ইবনু আবু মূসা (রাঃ) বলেন, 'আমি আমার পিতা আবু মূসাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিনের সেই সময়টা সম্পর্কে (যে সময় বান্দা তার প্রতিপালকের নিকট যা চাইবে তাই পাবে) বলেন, উহা ইমামের মিম্বরে বসা হ'তে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৭-১৩৫৮)*। জুম'আর দিন সুন্দরভাবে গোসল করে সাধ্যমত উত্তম পোশাক পরে ও সুগন্ধি লাগিয়ে আগে আগে মসজিদে যাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮৭)*।

অন্য এক বর্ণনায় আছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে গোসল করে সাধ্যানুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধান করে, তেল মালিশ করে অথবা সুগন্ধি থাকলে তা লাগিয়ে মসজিদে যাবে এবং দুই ব্যক্তির মাঝে ফাঁকা রাখবে না। তারপর ইমাম যখন খুৎবা দিবে তখন চুপ করে খুৎবা শুনবে, নিশ্চয়ই তার এক জুম'আ হ'তে অপর জুম'আ পর্যন্ত সমস্ত ছগীরা গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হয় *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮৭)*।

জুম'আর দিন যে যত আগে মসজিদে যাবে সে তত বেশী নেকীর অধিকারী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন জুম'আর দিন আসে ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়ায় এবং যে যত আগে আসে তার তত বেশী নেকী লিখতে থাকেন। এদিন যে সর্বপ্রথম মসজিদে আসে তার জন্য একটি উট কুরবানী করার সমপরিমাণ ছাওয়াব লেখা হয়। এরপর যে আসে তার জন্য একটি গরু কুরবানী করার সমপরিমাণ ছাওয়াব লেখা হয়। তারপর আগমনকারীর জন্য একটি দুম্বা, এরপর আগমনকারীর জন্য একটি মুরগী, তারপর আগমনকারীর জন্য একটি ডিম দান করার সমপরিমাণ ছাওয়াব লেখা হয়। অনুরূপভাবে আগমনকারীরা ছাওয়া পেতে থাকেন। যখন ইমাম খুৎবার জন্য বের হন ফেরেশতাগণ তখন খাতা বন্ধ করেন এবং খুৎবা শুনতে থাকেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩০২)*।

খুৎবা চলাকালীন সময়ে চুপ করে খুৎবা শ্রবণ করা যরূরী এবং কথা বলা হারাম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩০৩)*। এমনকি কেউ যদি কথা বলে তাকেও চুপ কর বলা ঠিক নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩০৩)*।

জুম'আর খুৎবাঃ

জুম'আর জন্য দু'টি খুৎবা দেওয়া সুন্নাত। দুই খুৎবার মাঝখানে বসতে হয় *(আর-রওযা ১/৩৪৫ পৃঃ)*। ইমাম মিম্বরে বসার সময় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন। আবুবকর, ওমর (রাঃ) নিয়মিত এটি করতেন। খত্বীব ছাহেব হাতে লাঠি নিয়ে দাড়িয়ে খুৎবা দিবেন। ১ম খুৎবায় হামদ, ছানা ও ক্বিরাআত ছাড়াও সকলকে নছীহত করবেন। অতঃপর বসবেন। দ্বিতীয় খুৎবায় হামদ, দরূদ সহ সকল

মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন *(ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ত্বাবারানী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩০-২৩৪)*।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) হামদ, দরূদ ও নছীহত এই তিনটি বিষয়কে খুৎবার জন্য ওয়াজিব বলেছেন। এতদ্ব্যতীত সূরা ক্বাফ-এর প্রথমাংশ বা অন্য কিছু আয়াত তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব *(মির'আত ২/৩০৮, ৩১০ পৃঃ)*। খুৎবা মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় প্রদান করতে হবে। শ্রোতগণকে জান্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর খুৎবার বিষয়। খুৎবার মূল উদ্দেশ্যও এটাই। আর এজন্যই খুৎবার প্রচলন করা হয়েছে। জুম'আর দিনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, যারা জুম'আর দিন জুম'আর ছালাত হ'তে বিরত থাকে, আমার মনে হয় আমি তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেই। জুম'আর দিনে যাবতীয় কাজের ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে কেবল আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে সময় কাটানো প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর জন্য যরূরী।

প্রকাশ থাকে যে, জুম'আর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই। মুছল্লী কেবল তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাক'আত ছালাত পড়ে বসে থাকবে। সময় পেলে খুৎবার পূর্ব পর্যন্ত যত খুশী নফল ছালাত আদায় করতে পারে। জুম'আর ছালাতের পরে মসজিদে চার রাক'আত অথবা বাড়িতে এসে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। মসজিদে কিংবা বাড়িতে ২-৪ মোট ৬ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬; মির'আত ১১৪৮ পৃঃ)*।

দুই ঈদের ছালাতঃ

ঈদায়েনের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালূ হয়। ঈদায়েন হ'ল মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর নির্ধারিত বার্ষিক দুইটি আনন্দ উৎসবের দিন। ঈদায়েনের উৎসবের দিন দু'টি হচ্ছে মুসলমানদের একে অপরের সাথে মিলিত হওয়ার দিন। এই দিনে বংশগৌরব, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি পরিহার করে ধনী-নির্ধন সকলে মিলে এক সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করা আবশ্যক। পবিত্রতা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এদিন দু'টি পালিত হবে। এতে আনন্দ উৎসবের নামে অশ্লীলতা যেমন থাকবে না, তেমনি বিনোদনের নামে উচ্ছৃংখলতা ও বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চা করাও যাবে না।

প্রাক ইসলামী যুগে আরব দেশে অন্যদের অনুকরণে নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব পালনের রেওয়ায ছিল। রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে দেখলেন যে, মদীনাবাসী বছরে দু'দিন খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসব করে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বললেন,

قَدْ اَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الاَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ

'আল্লাহ তোমাদের ঐ দু'দিনের পরিবর্তে দু'টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন। ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎর' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৪৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৫৫)*।

গুরুত্বঃ ঈদায়নের ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটা সূর্যোদয়ের পরে সকাল সকাল খোলা ময়দানে গিয়ে পড়তে হয়। রাসূল (ছাঃ) নিয়মিতভাবে এ ছালাত আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদায়নের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৬পৃঃ)*। ঈদায়নের ছালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সকল নারী-পুরুষকে তো ঈদের মাঠে যেতে হবে। এমনকি ঋতুবতী মহিলাদেরকেও যেতে হবে। তারা ছালাত আদায়কারীদের নিকট থেকে দূরে অবস্থান করবে এবং তাকবীর ও দো'আয় শরীক হবে *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৯৭৪-৯৮১; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৩১)*। শুধু তাই নয়, যাদের পর্দা করে ঈদের মাঠে যাওয়ার মত চাদর নেই, তাদেরকে সাথীদের চাদর মাথায় দিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৯৮০; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৩১)*। মহিলারা সকল ছালাতে পুরুষদের পিছনে থাকবে।

ঈদায়নের দিনে করণীয়ঃ

জুম'আর দিনে যেমন সাধ্যমত সুন্দর পোশাক পরিধানের কথা বলা হয়েছে, ঈদায়েনের ব্যাপারে তেমনটি বলা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) খুব প্রত্যুষে ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হ'তেন। ঈদুল ফিতরের দিন তিনি কিছু না খেয়ে বের হ'তেন না। এদিন তিনি বেজোড় সংখ্যক কয়েকটি খেজুর খেতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৪৯)*। অন্য এক বর্ণনায় আছে-

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّي يَطْعَمَ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الاَضْحَى حَتَّي يُصَلِّيَ.

বুরাইদা আসলামী বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু না খেয়ে বের হ'তেন না এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছূ খেতেন না *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৫৬ সনদ ছহীহ)*।

রাসূল (ছাঃ) ঈদগাহে পৌঁছে প্রথমে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। তারপর খুৎবা দিতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৪২)*। খুৎবায় জনতাকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিতেন ও নছীহত করতেন। আর সে নছীহত ছিল পরকালের ভয়, আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। তিনি প্রয়োজন মাফিক কথা বলতেন। বিশেষ করে মহিলাদেরকেও ভিন্নভাবে উপদেশ দিতেন *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৯৭৮; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২৯)*।

ঈদের দিনে বেশী তাকবীর বলার কথা এসেছে। এমনকি ঈদুল আযহার চাঁদ দেখার পর হ'তে রাসূল (ছাঃ) তাকবীর বলতেন *(বুখারী হা/৯৭০)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের আমল অন্যান্য দিনের আমলের তুলনায় উত্তম। তারা জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদও কি উত্তম নয়? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা আলাদা, যে নিজের জান মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদ করে এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৯৬৯)*।

ঈদের দিন ছালাতের আগে কুরবানী করা যাবে না। যে ছালাতের আগে কুরবানী করবে তার কুরবানী কুরবানী হিসাবে গণ্য হবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৫৩)*। প্রকাশ থাকে যে, যিলহজ্জ মাসে চাঁদ দেখার পর হ'তে কুরবানীর দিন পর্যন্ত নখ, চুল কাটা সুন্নাত পরিপন্থী।

ঈদের ছালাতের পদ্ধতিঃ

অন্যান্য ছালাত হ'তে ঈদের ছালাতের পদ্ধতি একটু ভিন্নতর। এক্বামত ও আযান ছাড়াই ১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পাঠের পর ধীর-স্থিরভাবে স্বল্প বিরতি সহ পর পর সাত তাকবীর দিয়ে আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ ইমাম সরবে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বেন। আর মুক্তাদীগণ চুপে চুপে কেবল সূরা

ফাতিহা পড়বেন। তারপর রুকূ-সিজদা সেরে অনুরূপভাবে ২য় রাক'আতে দাড়িয়ে ধীর-স্থিরভাবে পর পর পাঁচ তাকবীর দিয়ে কেবল বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বেন।

রাসূল (ছাঃ) এসময় ১ম রাক'আতে সূরা ক্বাফ অথবা 'আলা এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা 'ক্বামার' অথবা 'গাশিয়া' পড়তেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৪০-৪১)*। প্রত্যেক তাকবীরের সময়ে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হবে এবং বুকে বাঁধবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা সিজদায়ে সাহো লাগে না *(মির'আত হা/১৪৫৭, ২/৩৪১পৃঃ)*।

রাতের ছালাত বা তাহাজ্জুদ ছালাত

রাতের ছালাত বা তাহাজ্জুদ ছালাত নফল হ'লেও তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হল রাতের ছালাত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাতহা/১৯৪১)*। রাতের ছালাত শেষে বিতর ছালাত পড়তে হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২৪৮)*। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিই রাতের ছালাতের অন্তর্ভুক্ত। রামাযান মাসে এটাকে তারাবীহ বলা হয়। অন্যান্য মাসে আদায় করা হ'লে একে তাহাজ্জুদ বলা হয়। মূলতঃ এ দু'ছালাত একই। রামাযান মাসে প্রথম রাতে তারাবীহ পড়লে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২২৪)*। তারাবীহ বা তাহাজ্জুদে রাসূল (ছাঃ) লম্বা ক্বিরাআত সহ দীর্ঘ সময় ধরে ক্বিয়াম, কু'ঊদ, রুকূ', সিজদা ও তাসবীহ পাঠে মশগূল থাকতেন। রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ যে তিন দিন তিনি মসজিদে নববীতে জামা'আত সহকারে তারাবীহ পড়েছিলেন সে তিন দিনের প্রথম দিন রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, দ্বিতীয় দিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ও তৃতীয় দিন স্ত্রী-কন্যাসহ সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ছালাত আদায় করেন। মুছল্লীদের দারুন আগ্রহ দেখে তারাবীহ ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি আর জামা'আত সহকারে তারাবীহ পড়াননি *(মির'আত হা/১৩১১)*।

এক নযরে রাতের নফল ছালাতের রাক'আত সংখ্যা ও নিয়মঃ

রাসূল (ছাঃ) রাতের ছালাত ১৩ রাক'আতের বেশী পড়েননি। ১৩ রাক'আত ছালাত আদায় করলে প্রথমে দুই দুই করে আট রাক'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ পড়তেন। তারপর একটানা পাঁচ রাক'আত বিতর পড়তেন *(মুসলিম প্রভৃতি)*।

অথবা দুই দুই করে বার রাক‘আত পড়ে তারপর ১ রাক‘আত বিতর পড়তেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯৭)*।

১১ রাক‘আতঃ দুই দুই করে ৮ রাক‘আত অতঃপর একটানা তিন রাক‘আত বিতর পড়ে শেষ বৈঠক করবে *(বুখারী, মুসলিম)*। রামাযান ও অন্যান্য সময়ে এটা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর অধিকাংশ রাতের আমল। ১১ রাক‘আত- দুই দুই করে মোট ১০ রাক‘আত এবং পরে এক রাক‘আত বিতর পড়তে হবে। অথবা ২ রাক‘আত তারাবীহ পড়ে একটানা ৮ রাক‘আত পড়ে ১ম বৈঠক করে নবম রাক‘আত শেষে বৈঠক করে ৯ রাক‘আত বিতর পড়তেন *(মুসলিম)*।

৯ রাক‘আতঃ দুই দুই করে ৬ রাক‘আত। অতঃপর তিন রাক‘আত বিতর। অথবা একটানা ৭ রাক‘আত বিতর পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর ২ রাক‘আত সহ মোট ৯ রাক‘আত পড়বে *(মুসলিম হা/১৩৯ ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭৮)*।

৭ রাক‘আতঃ দুই দুই করে ৬ রাক‘আত অতঃপর ১ রাক‘আত বিতর। অথবা দুই দুই করে ৪ রাক‘আত। অতঃপর তিন রাক‘আত বিতর *(বুখারী)*।

৫ রাক‘আতঃ দুই দুই করে ৪ রাক‘আত। অতঃপর ১ রাক‘আত বিতর। অথবা একটানা পাঁচ রাক‘আত বিতর পড়তেন। দুই দুই করে ৮ রাক‘আত অতঃপর একটানা ৩ রাক‘আত বিতর। এটা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ। বৃদ্ধাবস্থায় কিংবা সময় কম থাকলে ঐ নিয়মে আদায় করতেন।

প্রকাশ থাকে যে, ২০ রাক‘আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের প্রমাণে বর্ণিত হাদীছগুলির কিছু জাল, বাকী সব যঈফ *(আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৩০২; ১/৪০৮ পৃঃ; ইরওয়া হা/৪৪৬, ৪৪৫; মির‘আত হা/১৩০৮)*।

রাসূল (ছাঃ) দু’রাক‘আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে ৮ রাক‘আত তারাবীহ শেষে কখনো এক কখনো তিন কখনোবা পাঁচ রাক‘আত বিতর এক ছালামে পড়তেন। জেনে রাখা আবশ্যক যে, ছালাতের রাক‘আত সংখ্যা শুধু বৃদ্ধি না করে যথার্থ খুশু-খুযূ‘ সহকারে ক্বিয়াম-কু‘ঊদ, রুকূ‘-সুজূদ সঠিকভাবে আদায় করে দীর্ঘ সময় নিয়ে ছালাত আদায় করাই উত্তম।

যদি কেউ এশার ছালাত পড়ার পর বিতর আদায় করে ঘুমিয়ে যায় এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার ইচ্ছা করে তাহ’লে তাহাজ্জুদ পড়ে তাকে আর পুনরায়

বিতর পড়তে হবে না। কেননা এক রাতে দুইবার বিতর পড়ার প্রয়োজন নেই *(নায়ল ৩/৩১৪-১৭পৃঃ 'বিতর' অধ্যায়)*। ছালাত শেষে তিনবার 'সুবহ:ানাল মালিকিল কুদ্দুস' পড়া উচিত *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৭৪)*। অতঃপর ইচ্ছা করলে দু'রাক'আত নফল ছালাত হালকাভাবে আদায় করতে পারে। সেখানে সূরা 'যিলযাল' ও 'কাফিরূণ' পড়া যায়। তবে অন্য সূরাও পড়া যায় *(মুযযাম্মিল ২০)*।

নবী করীম (ছাঃ) রাতের ছালাতের জন্য উঠলে যা পড়তেনঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বিছানা থেকে উঠে সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকূ পাঠ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১২৭)*। অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (ছাঃ) বিছানা থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকূর ১ম পাঁচ আয়াত পড়তেন *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১২০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৪১)*।

সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকূর ১ম পাঁচ আয়াতঃ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيَاتٍ لِّأُوْلِيْ الْاَلْبَابِ– الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ– رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ– رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ– رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا، رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّأَتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ– رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِعَادِ–

উচ্চারণঃ *ইন্না ফী খলক্বিস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়াখতিলা- ফিললাইল ওয়ানাহা-রি লাআ-ইয়া-তিল লি উলিল আলবাব। আল্লাযীনা ইয়ায কুরুনাল্ল-হা ক্বিইয়া-মাঁও ওয়া কু'ঊদাঁও ওয়া 'আলা- জুনূবিহিম ওয়া ইয়াতাফাককারুনা ফী খলক্বিস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, রব্বানা- মা- খলাক্বতা হা-যা বা-ত্বিলান সুবহ:ানাকা ফাক্বিনা- 'আযা-বান্না-র। রব্বানা- ইন্নাকা মাংতুদখিলিননা-রা ফাক্বদ্ আখঝাইতাহু, ওয়ামা- লিযয-লিমীনা মিন আংছ-র্। রব্বানা-ইন্নানা- সামি'না মুনা-দিইয়াই ইউনা-দী লিল ঈমানি আন আ-মিনূ বিরব্বিকুম ফা আ-মান্না,*

রব্বানা- ফাগফির লানা- যুনূবানা- ওয়া কাফফির আন্না- সাইয়ি আ-তিনা- ওয়া তাওয়াফফানা- মা'আল আবর-র্। রব্বানা- ওয়া আ-তিনা মা- ওয়াত তানা- 'আলা- রসুলিকা ওয়লা- তুখঝিনা- ইয়াওমাল ক্বিইয়া-মাতি ইন্নাকা লা- তুখলিফুল মী'আদ।

রাসূল (ছাঃ) তাহাজ্জুদ ছালাত পড়ার জন্য উঠে ১০ বার আল্ল-হু আকবার, ১০ বার আল-হ:ামদু লিল্লা-হ, ১০ বার সুবহ:ানাল্লা-হি ওয়া বিহ:ামদিহী, ১০ বার আস্তাগফিরুল্ল-হ, ১০ বার লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু পড়তেন। প্রকাশ থাকে যে, সুবহ:ানাল মালিকিল কুদ্দুস এবং আল্ল-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন যীক্বিদ্দুনইয়া ওয়া যীক্বি ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ ১০ বার করে বলার প্রমাণে পেশকৃত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১২১৬)*।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন রাতে তাহাজ্জুদে দাঁড়াতেন তখন পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَالِكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَ لِقَائُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةُ حَقٌّ وَ النَّارُ حَقٌّ وَ النَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَ مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَ لاَ إِلهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা লাকাল হ:ামদু আংতা ক্বইয়িমুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয্ব, ওয়ামাং ফীহিন্না ওয়া লাকাল হ:ামদু আংতা নূরুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয্ব, ওয়ামাং ফীহিন্না ওয়ালাকা হ:ামদু আংতা মা-লিকুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরয্ব, ওমাং ফীহিন্না ওয়ালাকাল হ:ামদু আংতাল হ:াক্বক্ব, ওয়া'দুকাল হ:াক্ব ওয়া লিক্বা-উকা হ:াক্বকুন ওয়া ক্বওলুকা হ;াক্বকুন, ওয়াল জান্নাতু হ;াক্বকুন, ওয়ান নারু হ:াক্বকুন, ওয়ান নাবয়্যুনা হ;াক্বকুন, ওয়া মুহ:াম্মাদুন হ;াক্বকুন, ওয়াস সা'আতু হ;াক্বকুন, আল্ল-হুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আ-মাংতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াককআলতু, ওয়া ইলাইকা আ-নাবতু ওয়াবিকা খা-স্বামতু ওয়া ইলাইকা*

হ:কামতু ফাগফিরলী মা- ক্বদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা- আ'লাংতু ওয়ামা- আংতা আ''লামু বিহী মিন্নী আংতাল মুক্বাদ্দিমু, ওয়া আংতাল মুআ-খখিরু, লা-ইলা-হা ইল্লা- আংতা ওয়া লা-ইলা-হা গউরুক।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। আসমান, যমীন এবং এদের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে সবকিছুর তুমিই অধিকর্তা। প্রশংসা মাত্রই তোমার। আসমান, যমীন এবং এদের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে, তুমি সবকিছুর নূর বা জ্যোতি। (হে আল্লাহ!) প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। আসমান, যমীন এবং উভয়ের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তুমি ঐ সবের প্রতিপালক। (হে আল্লাহ!) প্রশংসা মাত্রই তোমার। আসমান ও যমীনের রাজত্ব তোমার। সকল গুণকীর্তন তোমার জন্যই। তুমি সত্য, তোমার অঙ্গীকার সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার দর্শন লাভ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ (ছাঃ) সত্য এবং ক্বিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! তোমার নিকটে আত্মসমর্পন করলাম, তোমারই উপর নির্ভরশীল হ'লাম, তোমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হ'লাম, তোমারই সাহায্যের প্রত্যাশায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লাম এবং তোমাকেই বিচারক নির্ধারণ করলাম। অতএব আমার পূর্বের ও পরের গোপনীয় এবং প্রকাশ্য দুষ্কর্ম সমূহ মাফ করে দাও। তুমি ব্যতীত ইবদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ১০৭ হা/১২১১ 'রাতে ছালাতে দাঁড়ানোর সময় কি বলবে' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৪৩)*।

অন্য এক বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন রাত্রে উঠে ছালাত শুরু করতেন তখন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ تُهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمَ–

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা রব্বা জিবরঈলা ওয়া মীকা-ঈলা ওয়া ইসর-ফীলা ফা-ত্বিরস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি 'ধা-লিমাল গপবি ওয়াশ শাহা-দাতি আংতা তাহ:কুমু বাইনা ইবা-দাতিকা ফীমা কা-নূ ফীহি ইয়াখ তালিফূনা ইহদিনা লিমা-উখতুলিফা ফীহি মিনাল হ:াক্বি বিইযনিকা ইন্নাকা তাহদী মাং তাশাউ ইলা- সিরা-ত্বিম মুসতাক্বীম (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৪৪)*।

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক, আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা তোমার বান্দারা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করে তুমি তার ফায়ছালা কর। যে বিষয়ে মতবিরোধ করা হয়েছে সে বিষয়ে সঠিক পথ দেখাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সহজ-সরল পথ দেখাও’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)*।

لاَ اِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لاَ اِلهَ إلاَّ اللهُ وَاللهُ أكْبَرُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণঃ *লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌:দাহূ লা- শারীকা লাহ, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হ:াম্‌দু ওয়া হুওয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর, সুব্‌হ:া-নাল্লা-হি ওয়াল হ:ামদু লিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার, ওয়া লা- হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হিল ‘আলিইয়িল ‘আয:ীম- রব্বিগ্‌ ফির্‌লী।*

অর্থঃ ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই অধীনে, প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সমস্ত বস্তুর প্রতি ক্ষমতাশীল। আমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি। প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। তাঁর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি বা কোন উপায় নেই। তিনি উচ্চ, বড়। শেষে বলবে, ‘হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও। তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে’ *(বুখারী, ইবনু মাজাহ, হা/৩১৪২; মিশকাত হা/১২১৩ ‘রাতে জাগ্রত হয়ে দো‘আ’ অনুচ্ছেদ, ‘ছালাত’ অধ্যায়)*।

ছালাতুয যুহা বা চাশতের ছালাত

যুহা অর্থ সূর্যের ঔজ্জ্বল্য। সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয়ে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত এ ছালাত পড়া হয় বলেই একে ছালাতুয যুহা বলা হয়। আমাদের দেশে এ ছালাত এশরাক ও চাশত নামে পরিচিত। আসলে এ দু’টি একই ছালাত। প্রথম প্রহরের দিকে পড়লে একে এশরাক বলা হয় এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে চাশত বলা হয়। এ ছালাতের আরেকটি নাম হচ্ছে আওয়াবীন। উল্লেখ্য, মাগরিবের পর ছয় রাকা‘আত ছালাতকে আওয়াবীন বলে

সমাজে যে প্রচলন আছে, তা সঠিক নয়। মূলতঃ এশরাক ও চাশতের অপর নাম হচ্ছে আওযাবীন।

ফযীলতঃ

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصْبَحُ عَلَى كُـلِّ سَـلاَمٍ مِـنْ أَحَـدِكُمْ صَـدَقَةٌ فَكُـلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرُ بِـالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهِيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيَجْزِيُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সকাল হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য একটি ছাদাক্বা করা আবশ্যক। তবে (মনে রেখো) তোমাদের প্রত্যেক তাসবীহ একটি ছাদাক্বা, প্রত্যেক তাহমীদ একটি ছাদাক্বা, প্রত্যেক তাহলীল একটি ছাদাক্বা, প্রত্যেক তাকবীর একটি ছাদাক্বা এবং সৎকাজের আদেশ একটি ছাদাক্বা এবং অসৎকাজে নিষেধ একটি ছাদাক্বা। অবশ্য এশরাক বা চাশতের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা এসবের পরিবর্তে যথেষ্ট' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১১; বাংলা মিশকাত হা/১২৩৬)*।

তাসবীহ- সুবহ:ানাল্লাহ, তাহমীদ-আলহামদুলিল্লাহ, তাহলীল- লা-ইলাহা ইল্লাল্ল-হ, তাকবীর-আল্ল-হু আকবার বলা। প্রত্যেকটিই একটি করে ছাদাক্বা বিশেষ।

চাশতের ছালাতের রাক'আত সংখ্যা ২, ৪, ৮, ১২ পর্যন্ত পাওয়অ যায়। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) ৮ রাক'আত ছালাত আদায় করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৩৪)*। এ ছালাত দুই দুই রাক'আত করে পড়তে হয়।

সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাত

পৃথিবীতে চন্দ্র, সূর্য আল্লাহর কুদরতের দু'টি অন্যতম নিদর্শন। এই নিদর্শন দুইটির গ্রহণ শুরু হ'লে আল্লাহর প্রতি গভীর আনুগত্য ও ভীতি সহকারে এর ক্ষতি থেকে বাঁচা এবং কল্যাণ হ'তে উপকৃত হবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে জাম'আত সহকারে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে শেষে খুৎবা দিতে হয়। এই ছালাতের বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। যাতে দু'রাক'আত ছালাতে ১০টি রুকূ' হয়।

তবে ৪টি রুকূর হাদীছটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ *(যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, ১২৪ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, কারো জন্ম বা মৃত্যুতে এদের গ্রহণ হয় না।

عن عائشة رضـ قَالَتْ اِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الـصَّلٰوةَ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَـعَ سَجْدَاتٍ قَالَـتْ عَائِـشَةُ مَـا رَكَعْـتُ رُكُوْعًا قَطُّ وَلاَ سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ اَطْوَلَ مِنْهُ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় একবার সূর্যগ্রহণ হল তখন তিনি ছালাতের জামা'আত প্রস্তুত বলে তিনি লোকদেরকে আহ্বান করার জন্য একজন আহ্বায়ক পাঠালেন। লোকেরা সমবেত হল। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হ'লেন এবং চার রুকূ চার সিজদা দিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করালেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি কখনো এমন রুকূ করিনি এবং সিজদাও করিনি যা, এই সিজদা অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল *(মুত্তাফক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৯৫)*।

ছালাতের পদ্ধতিঃ

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে একদা সূর্য গ্রহণ হ'লে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে ছালাত আদায় করে। প্রথমে তিনি ছালাতে দাঁড়ালেন এবং সূরা বাক্বারাহর মত দীর্ঘ ক্বিরাআত করলেন। অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করলেন। তারপর মাথা তুলে ক্বিরাআত করতে লাগলেন। তবে প্রথম ক্বিরাআতের চেয়ে কিছু কম ক্বিরাআত করে দ্বিতীয় রুকূতে গেলেন। এবারের রুকূ প্রথম রুকূর চেয়ে কিছুটা কম দীর্ঘ হল। তারপর তিনি রুকূ হ'তে মাথা তুলে সিজদা করলেন। অতঃপর সিজদা শেষে লম্বা ক্বিরাআত করলেন। তবে প্রথম বারের তুলনায় কিছুটা কম ছিল। এরপর তিনি তৃতীয়বার লম্বা রুকূ করলেন যা প্রথমবার রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। রুকূ থেকে মাথা তুলে পুনরায় ক্বিরাআত করলেন। যা প্রথমবারের তুলনায় কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি চতুর্থবার রুকূ করলেন এবং রুকূ থেকে উঠে সিজদায় গেলেন। এরপর সালাম ফিরিয়ে ছালাত শেষ করলেন। ততক্ষণে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তারপর ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৯৭)*।

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের ছালাতে মহিলারাও পুরুষের সাথে জামা'আতে অংশ নিতে পারে *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১০৫৩)*। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় যিকির-আযকার, দো'আ ও ছালাত আদায় করতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ শেষ না হয় *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১০৬০)*।

প্রয়োজন পূরণের ছালাত

সঙ্গত কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য বান্দা স্বীয় প্রভুর নিকট নিম্নের তরীকায় ছালাত আদায়ের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থুনা করতে পারে। ইমাম আহমাদ ছহীহ সনদে আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসুল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করল। অতঃপর পূর্ণভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল। আল্লাহ তাকে দান করেন যা সে প্রার্থনা করে সাথে সাথে কিংবা কিছূটা বিলম্বে হ'লেও *(মুসনাদে আহমাদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫৯পৃঃ)*।

ক্ষমা প্রার্থনার ছালাত

عن على قال حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قَالَ سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يُقَدِّمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّى ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ

قَرَأَ وَالَّذِيْنَ فَعَلُوْا فَاحِشَةً لَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ.

আলী (রাঃ) বলেন, আমার নিকট আবুবকর (রাঃ) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি সত্য বলেছেন। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন গুনাহ করবে অতঃপর উঠে পবিত্রতা হাছিল করে এবং কিছু নফল ছালাত আদায় করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন

اِذْ فَعَلُوا فَحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوْبِهِمْ–

'যখন কেউ কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে' *(আলে ইমরান ১৩৫)*।

আবুবকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, কোন লোক যদি গুনাহ করে। অতঃপর উঠে দাড়িয়ে দু'রাক'আত ছালাত

আদায় করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহ'লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, তিরমিযী, হাদীছ হাসান, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫৯; ছালাতুর রাসূল ১৩৫ পৃঃ)*।

তওবার জন্য নিম্নের দো'আটি বিশেষভাবে সিজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করতে হবে-

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ–

উচ্চারণঃ *আস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হ:াইয়ুল ক্বাইয়ূম ওয়া আতূবু ইলাইহি।*

অর্থঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আমি তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তাওবা করছি' *(ছহীহ তিরমিযী, হা/২৮৩১)।*

ছালাতুল ইস্তেখারা বা কল্যাণ ইঙ্গিত প্রার্থনার ছালাত

ইস্তেখারা অর্থ কোন কাজের কল্যাণ প্রার্থনা করা। মুসলমান বান্দা যখন

কোন কাজের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হয় এবং নিজে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে না পারে তখন আল্লাহর নিকট সঠিক সিদ্ধান্ত চেয়ে বিশেষ নিয়মে প্রার্থনা করাকে ছালাতুল ইস্তেখারা বলে।

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে আল্লাহর নিকট ইসতেখারা করার নিয়ম ও দো'আ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে তখন সে যেন ফরয ছালাত ছাড়া দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে। অতঃপর নিম্নের দো'আটি পড়ে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لاَ أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لاَ أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هذَا الْـاَمْرَ خَيْـرٌ لِـىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ مَعَاشِىْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَ يَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

اَنَّ هذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِىْ فِىْ دِيْنِى وَ مَعَاشِىْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَ اقْدُرِ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهِ–

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌তাখীরুকা বি 'ইলমিকা ওয়াস্‌তাক্বদিরুকা বিক্বুদরতিকা ওয়া আস্‌আলুকা মিং ফায্বলিকাল 'আযঃীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা- আক্বদির, ওয়া তা'লামু ওয়ালা- আ'লাম, ওয়া আংতা 'আল্লা-মুল গুয়ূব আল্ল-হুম্মা ইং কুংতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা খায়রুন লী ফী দীনী ওয়া মা'আশী ওয়া 'আক্বিবাতি আমরী ('আ-জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী) ফাক্বদুরহু লী ওয়া ইয়াসসিরহু লী ছুম্মা বা-রিকলী ফীহ, ওয়া ইং কূংতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুল লী ফী দীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্ববাতি আমরী ('আ-জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী) ফাস্বরিফহু 'আন্নী ওয়াস্‌রিফনী 'আনহু ওয়াকদির লিয়াল খয়রা হায়ছু কা-না ছুম্মারয্বিনী বিহ।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে এই বিষয়ের ভাল দিক জ্ঞাত হওয়া প্রার্থনা করছি এবং তোমারই ক্ষমতার সাহায্যে তোমার নিকটে (উহা লাভের) ক্ষমতা চাচ্ছি। আমি চাই তোমার নিকট বড় অনুগ্রহ। তুমি সক্ষম, আমি সক্ষম নই। তুমি জান আমি জানিনা। তুমি অদৃশ্যের খবর জান। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে কর এ বিষয়টি আমার জন্য ভাল হবে, আমার দ্বীন, আমার জীবন ধারণ ও আমারে পরিণামের ব্যাপারে। তাহ'লে তুমি আমার জন্য তা নির্ধারণ কর এবং আমার পক্ষে সহজ করে দাও এবং আমার জন্য এতে বরকত দান কর। আর তুমি যদি মনে কর বিষয়টি আমার জন্য অকল্যাণকর, তবে আমার দ্বীন, আমার জীবন ধারণ ও আমার পরিণামের ব্যাপারে তাহ'লে তুমি আমা হ'তে ফিরিয়ে রাখ এবং আমাকেও উহা হ'তে ফিরিয়ে রাখ'। আমার জন্য ভাল নির্ধারণ কর, যেখানেই হৌক এবং আমাকে উহাতে সন্তুষ্ট রাখ (*বুখারী, মিশকাত, পৃঃ ১১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৪৭*)।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, আমরা যদি এমন কোন কাজের সম্মুখীন হই যে সে কাজের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, তখন রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসারে ইস্তেখারার ছালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দো'আ করে আমরা সঠিক সিদ্ধন্ত প্রার্থনা করব। যে কাজ করতে যাব তার প্রতি কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে এবং কোন দিকে ঝুঁকে না পড়ে নিরপেক্ষভাবে সরল মনে ইস্তেখারার ছালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যে দিকে মন টানবে সেভাবেই কাজ করতে হবে। এজন্য দু'রাক'আত ছালাত দিন বা রাতে যে কোন সময়ে পড়া যায়। সূরা

ফাতিহা পাঠের পর অন্য যে কোন সূরা পড়তে হবে। অতঃপর হামদ ও দরূদ পাঠ করবে। যেমন আলহ:ামদুলিল্লা-হি রব্বিল 'আলামীন ওয়াছ ছলাতু ওয়াস সালা-মু আলা রসূলিহিল কারীম। অতঃপর ইস্তেখারার দো'আ পাঠ করতে হবে।

এখানে 'হা-যাল আমর' অর্থাৎ এখানে প্রার্থনাকারী নিজের কাজের নাম উল্লেখ করবে *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৪৭)*। ইস্তেখারার দো'আটি ক্বিরাআতের পরে এবং রুকূ'র পূর্বে পাঠ করার জন্য আল্লামা সাইয়িদ সাবিক্ব বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫৮পৃঃ)*। তবে কেউ সালাম ফিরানো পূর্বেও বলতে পারে।

মুসাফির বা সফরকারীর ছালাত

আল্লাহর বাণী-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يُفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اَنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا–

'যখন তোমরা সফর কর তখন তোমাদের ছালাত ক্বছর করায় কোন দোষ নেই। যদি তোমরা আশংকা কর যে কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(নিসা ১০১)*।

ভ্রমণের সময় এবং ভয়-ভীতির সময় ছালাত ক্বছর করা যায়। ক্বছর অর্থ সংক্ষিপ্ত করা বা কমানো। পারিভাষিক অর্থে ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতকে দু'রাক'আত করে পড়াকে ক্বছর বলে। তবে মাগরিবের ছালাতকে তিন রাক'আতই পড়তে হবে *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১০৯২)*। সফর অবস্থায় ভয়-ভীতি না থাকলেও ছালাত ক্বছর করতে পারে।

ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) বলেন যে, একদা ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, যদি ভয়-ভীতি না থাকে তবুও কি ছালাত ক্বছর করতে হবে? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ এটিকে তোমাদের জন্য ছাদাক্বা হিসাবে প্রদান করেছেন। অতএব তোমরা তা গ্রহণ কর' *(মুসিলম, মিশকাত, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৫৭)*।

হারেছা ইবনু ওয়াহাব খুযাঈ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিয়ে মিনায় দুই রাক'আত ছালাত আদায় করেছিলেন। অথচ তখন আমরা সংখ্যায় বেশী

ছিলাম এবং শান্তি ও নিরাপদে ছিলাম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৫৬)*।

সফরের দূরত্ব এবং ক্বছরের মেয়াদঃ

সফরের দূরত্বের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে এক থেকে ৪৮ মাইল সংক্রান্ত ২০ ধরনের মতামত রয়েছে *(নায়ল ৪/১২২পৃঃ)*। আল্লাহর বাণীতে সফরের দূরত্বের কোন সীমারেখা উল্লেখ করা হয়নি। কেবলমাত্র সফরের কথা এসেছে। রাসূল (ছাঃ) থেকেও এর কোন সীমা নির্দেশ করা হয়নি *(যাদুল মা'আদ ১৪৬৩)*। অতএব সফর হিসাবে গণ্য হয় এমন দূরত্বে সফর করার জন্য বের হয়ে কিছু দূর গিয়ে ক্বছর করা যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) মদীনা থেকে যোহরের ছালাত ৪ রাক'আত আদায় করে বের হ'লেন। আর যুলহুলাইফা পৌঁছতে আছরের সময় হয়ে গেল এবং সেখানে তিনি ক্বছর করে ২ রাক'আত ছালাত আদায় করলেন *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১০৮৯)*।

সফরে ছালাত জমা করাঃ

সফরে থাকাকালীন যোহর, আছর একসাথে ভিন্ন ভিন্ন ইক্বামত দিয়ে দুই দুই রাক'আত করে মোট ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে মাগরিব ও এশা তিন ও দুই রাক'আত করে মোট ৫ রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১১০৯, ১১১২)*।

ভয়-ভীতি ব্যতীত মুক্বীম অবস্থায়ও কোন বিশেষ ওযর বশত দু'ওয়াক্তের ছালাতও সুন্নাত ছাড়াও একত্রে জমা করে পড়া যায়। যেমন যোহর ও আছর পৃথক ইক্বামতের মাধ্যমে চার চার রাক'আত করে এবং মাগরিব ও এশা অনুরূপ তিন ও চার রাক'আত একত্রে পড়া যায় *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৫৪৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল এটা কেন? তিনি বললেন, উম্মতের যাতে কষ্ট না হয়। এই সুযোগ ইস্তেহাযা বা প্রদর রোগাক্রান্ত মহিলা ও বহু মুত্রের রুগী বা অন্যান্য কঠিন রোগী এবং কর্মব্যস্ত লোকগণও বিশেষ ওযরবশত অনিয়মিতভাবে গ্রহণ করতে পারে *(নায়লুল আওত্বার ৪/১৩৬-৪০পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৭-১৮পৃঃ)*। তবে রোগীরা যতদিন পর্যন্ত সুস্থ না হয় ততদিন দুই ছালাতকে একত্রে পড়তে পারে। দুই ওয়াক্তের ছালাতকে জমা করে পড়ার নিয়ম হচ্ছে যোহরকে বিলম্ব করবে এবং আছরকে এগিয়ে পড়বে। অনুরূপভাবে মাগরিবকে দেরী করে এবং

এশাকে এগিয়ে নিয়ে একত্রে পড়বে *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১১১২)*। সফরে নফল ছালাত আদায় করা ও না করা উভয়ই জায়েয। তবে রাসূল (ছাঃ) সফরে বিতর ও ফজরের সুন্নাত ছাড়তেন না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৪০)*।

কত দিন পর্যন্ত ছালাত ক্বছর করা যায়ঃ

রাসূল (ছাঃ) একবার ১৯ দিন সফরে অবস্থান কালে ক্বছর করেছেন। আমরাও তাই করি। তার বেশী হ'লে পূর্ণ করি *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১০৮০)*। যদি কারো সফরের মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে তথাপি তিনি ক্বছর করবেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩)*। সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় ১৯ দিনের বেশী হ'লেও ক্বছর করা যায়। রাসূল (ছাঃ) তাবুক যুদ্ধের সময় ২০ দিন যাবৎ ক্বছর করেন। আনাস (রাঃ) শাম বা সিরিয়া সফরে এসে দু'বছর যাবৎ সেখানে থাকেন এবং ক্বছর করেন *(মির'আত ৩/২২১পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪ পৃঃ)*। স্থায়ী মুসাফির যানবাহনের চালক এবং কর্মচারীগণ সর্বদা ক্বছর করতে পারেন *(মির'আত ৩/২২১ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪ পৃঃ)*।

অসুস্থ ব্যক্তির ছালাতঃ

অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম হ'লে কিংবা রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে বসে শুয়ে কতিপয় ছালাত আদায় করবে *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১১১৭)*। আতা (রাঃ) বলেন, ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরাতে অক্ষম ব্যক্তি যে দিকে সম্ভব সে দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করবে *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১১১৭)*।

অসুস্থ ব্যক্তি সিজদার সময় সামনে বালিশ বা উচু অন্য কিছু নেওয়া যাবে না। যদি মাটিতে সিজদা করা অসম্ভব হয় তাহ'লে ইশারায় ছালাত আদায় করবে এবং সিজদার সময় কিছুটা বেশী মাথা ঝুকাবে *(ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহা হা/৩২৩)*। এক কথায় অসুস্থ ব্যক্তি তার সাধ্যমত ছালাত আদায় করবে। ছালাতের কোন বিকল্প নেই।

যাকাতের আলোচনা

যাকাতের সংজ্ঞাঃ زكوة শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় শরী'আতের নির্দেশ অনুসারে নিসাব পরিমাণ মালের একাংশ হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া এবং এর বিনিময় গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রাখাকে যাকাত বলে।

যাকাত আদায় করা ফরযঃ

যাকাত ইসলামের রুকন সমূহের মধ্যে তৃতীয়। ঈমান ও ছালাতের পর পরই যাকাতের স্থান। মহান আল্লাহ তার কালামে পাকে ছালাতের সঙ্গে সঙ্গে বহু জায়গায় যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর বাণী-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا–

'আপনি গ্রহণ করুন, তাদের মাল হ'তে যাকাত। যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবেন' *(তওবা ১০৩)*।

দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায় যাকাত ফরয হয়। যাকাত আদায় করতেই হবে। জ্ঞান থাকাবস্থায় যেমন ছালাত মাফ নেই, তেমনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিককে অবশ্যই যাকাত প্রদান করতে হবে। যাকাত আদায়ের কোন বিকল্প নেই। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণের পরিমাণ যদি নিসাব পরিমাণ মালের চেয়ে বেশী হয়, তাহ'লে তাকে যাকাত দিতে হবে না। ছালাতের ন্যায় যাকাতও পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয ছিল। আল্লাহ বলেন,

وَاِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِيْ الْقُرْبي وَالْيَتَمى والْمَسَكِيْنَ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلَوةَ وَاَتُوا الزَّكَوةَ–

'যখন আমি বনী ইসরাঈলদের নিকট হ'তে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করবে না। পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয় এবং ইয়াতীম, মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে এবং মানুষকে সৎ উপদেশ দিবে, ছালাত আদায় করবে এবং যাকাত দিবে' *(বাক্বারাহ ৮৩)*। যাকাত অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৯৮)*।

যাকাতের গুরুত্বঃ

ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। যাকাত ধনী ব্যক্তিদের নিকট হ'তে নিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এতে গরীব-মিসকীন অসহায় লোকেরা উপকৃত হয় এবং ধনীদের অন্তরের কৃপণতা দূরীভূত হয়। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা করে পাঠান তখন বললেন, মু'আয তুমি আহ'লে কিতাবের নিকট যাচ্ছ। তুমি তাদেরকে প্রথমে দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। যদি তারা এটা বিশ্বাস করে তাহ'লে তাদেরকে দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ তোমাদের উপর দিবা-রাত্রে ৫ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তাহ'লে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তোমাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তোমাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তাহ'লে তাদের উত্তম জিনিসগুলি গ্রহণ করা থেকে তুমি সাবধান হবে।

মহান আল্লাহর বাণী- 'যদি তারা তওবা করে ছালাত আদায় করে এবং যাকাত দেয় তাহ'লে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই' *(আলে ইমরান ১১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত ১টি *(বুখারী, মুসলিম)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'তুমি তাদের মাল হ'তে ছাদাক্বা গ্রহণ কর এবঙ তাদেরকে পবিত্র কর ও তাদের অন্তরকে সংশোধন কর' *(তওবা ১০৩)*। ইসলামে যাকাতের এই অপরিসীম গুরুত্বের কারণে আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন যে, আল্লাহর কসম! যারা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় যাকাত দিত তারা যদি আজ ছাগলের একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে তাহ'লে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৯৮)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যা অস্বীকার করলে ইসলামী শরী'আত অনুসারে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যরূরী।

যাকাত না দেওয়ার শাস্তিঃ

যারা যাকাত আদায় করে না তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ– يَّوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِجَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ–

'যারা সোন-রূপা জমা করে অথচ আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না অর্থাৎ যাকাত দেয় না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন সেগুলিকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর সেগুলি দ্বারা তাদের ললাটে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তার স্বাদ গ্রহণ কর যা দুনিয়াতে জমা করেছিলে' *(তওবা ৩৪-৩৫)*।

মহান আল্লাহ তাঁর কালামে পাকে অন্যত্র বলেন, 'আল্লাহ যাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেছেন আর তারা তা নিয়ে কৃপণতা করছে। তারা যেন এ ধারণা না করে যে, এটা তাদের জন্য কলাণকর বরং এটা তাদের জন্য অকল্যাণকর। আর তারা যা নিয়ে কৃপণতা করছে ক্বিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় শিকল হিসাবে পরিয়ে দেয়া হবে' *(আলে ইমরান ১৮০)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত দেয় না। ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টাকমাথা বিশিষ্ট সাপ বানানো হবে, যার চক্ষুর উপর দুইটি কাল দাগ থাকবে (অত্যন্ত বিষধর হবে)। ঐ সাপ তার গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে। আর সেই সাপ তার মুখের দুই পাশে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, তোমার সংরক্ষিত সম্পদ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আলে ইমরানের ১৮০ আয়াতটি পাঠ করেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি তার গরু, ছাগল, ভেড়া, উট ইত্যাদির হক্ব আদায় করল না অর্থাৎ এসবের যাকাত দিল না। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন ঐ গুলিকে মোটাতাজা অবস্থায় আনা হবে এবং ঐসব জানোয়ার তাদের খুর ও শিং দ্বারা মালিককে আঘাত করতে থাকবে। একদল অতিক্রম করবে, আবার অন্য দল আসবে এমনিভাবে বিচারকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৮৩)*। আর বিচারের ঐ দিন হবে ৫০ হাযার বছরের সমান *(মুসলিম, আহমাদ)*।

কোন কোন মালে যাকাত দিতে হবেঃ

কুরআন-হাদীছ পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, (১) ভূমি হ'তে উৎপাদিত ফসল (২) সোনা, রূপা, নগদ টাকা (৩) উট, গরু, ছাগল, ভেড়া এসবের যাকাত দিতে হয়। ব্যবসার মাল নগদ টাকা হিসাবে গণ্য।

(১) জমি থেকে উৎপাদিত ফসলঃ

জমিতে উৎপাদিত ফসলের যাকাত দিতে হবে। এমর্মে আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে সমস্ত পবিত্র জিনিস উপার্জন করেছ তা হ'তে দান কর। আর জমি হ'তে আমি যা বের করেছি তা হ'তেও' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*। তবে জমিতে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে যেসব খাদ্যশস্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায় সেগুলিতে যাকাত দতিে হবে। আর যেগুলি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায় না বরং পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেমন- তরকারী, শাক-সবজি ইত্যাদি। এগুলিতে যাকাত দিতে হবে না *(ইবনু আবী শায়বা, ইরওয়া হা/৮০১, ৩য় খণ্ড,)*।

জমি হ'তে উৎপাদিত ফসলের যাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে বৎসর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। আল্লাহ বলেন, وَاٰتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ–

'তোমরা ফসলের হক্ব আদায় কর যেদন ফসল কর্তন কর'। অর্থাৎ ফসল সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে যাকাত আদায় করতে হবে *(আন'আম ১৪১)*।

(২) সোনা-রূপা, ব্যবসায়ী পণ্য বা নগদ টাকার যাকাতঃ

সোনা, রূপা, ব্যবসায়ী দ্রব্য বা নগদ টাকার নিসাব পরিমাণ হ'লে এবং এক বৎসর যাবত জমা থাকলে তার যাকাত দিতে হবে। আল্লাহ বলেন,

الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ–

'যারা সোন-রূপা জমা করে অথচ আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না অর্থাৎ যাকাত দেয় না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন' *(তওবা ৩৪)*।

সোনা-রূপার যাকাত না দিলে পরকালে শাস্তির কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে নগদ অর্থ ও ব্যবসায়ী দ্রব্য। স্বর্ণের পরিমাণ যদি ২০ মিসকাল বা সাড়ে সাত ভরি এবং রূপার পরিমাণ যদি ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলার সমান হয় তাহ'লে যাকাত দিতে হবে *(ইরওয়া ৩য় খণ্ড, হা/৮১৫)*। নগদ অর্থ বা ব্যবসায়ী দ্রব্যের পরিমাণ সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপার মূল্যের সমান হলে এবং তা এক বৎসর পর্যন্ত জমা থাকলে তাতেও যাকাত দিতে হবে।

(৩) উট, গরু, ছাগল ও ভেড়ার যাকাতঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-কে উট, গরু, ছাগল ইত্যাদির যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, এগুলির অধিকারী ব্যক্তি যদি এগুলির হক্ব আদায় না করে অর্থাৎ যাকাত না দেয় তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন তাকে খোলা ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে। আর ঐসব পশুগুলি দলে দলে এসে তাদের খুর ও শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিচারকার্য শেষ না করবেন। আর ঐ দিনের পরিমাণ হবে ৫০ হাযার বছরের সমান। অতঃপর সে জান্নাতে যাবে নতুবা জাহান্নামে যাবে *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৮১)*। উল্লেখ্য যে, মহিষ গরুর মধ্যে শামিল এবং ভেড়া ছাগলের অন্তর্ভুক্ত। তবে ঘোড়া ও গাধার যাকাত নেই।

যাকাতের নিসাব বা কি পরিমাণ মাল হ'লে যাকাত দিতে হবেঃ

খাদ্যশস্য পাঁচ ওয়াসাক হ'লে যাকাত দিতে হবে। এর কম হ'লে যাকাত দিতে হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, খেজুর পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭০২)*। সুতরাং খাদ্যশস্যের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক হ'লে ১ সা' বা আড়াই কেজি পরিমাণ যাকাত দিতে হবে। ১ ওয়াসাক সমান ১৫০ কেজি, ৫ ওয়াসাক সমান ৭৫০ কেজি বা ১৮ মণ ৩০ কেজি। জমিতে এই পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হ'লে সেচের পানিতে উৎপাদিত ফসলের ২০ ভাগের এক ভাগ এবং সেচ ব্যতীত উৎপাদিত ফসলের ১০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। আমাদের দেশে পূর্বে প্রচলিত ৮০'র ওযন হিসাবে সেচ দেওয়া জমির ফসলে প্রায় ২০ মণে ১ মণ এবং সেচ বিহীন জমির ফসলে ১০ মণে ১ মণ হিসাবে যাকাত দিতে হবে। আর বর্তমান হিসাবে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ১৮ মণ ৩০ কেজির সমান হ'লে সেচ দেওয়া জমির ফসলের ২০ ভাগের ১ ভাগ এবং সেচ বিহীন জমির ফসলের ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে।

সোনা, রূপা, ব্যবসায়ী দ্রব্য বা নগদ টাকার নিসাবঃ

রাসূল (ছাঃ) বলেন, স্বর্ণ ২০ মিসকালের কমে যাকাত নেই এবং রূপা ২০০ দিরহামের কমে যাকাত নেই *(ইরওয়া ৩য় খণ্ড, হা/৮১৫)*। আমাদের দেশীয় হিসাবে ২০ মিসকাল সমান সাড়ে ৭ ভরি এবং ২০০ দিরহার সমান সাড়ে ৫২ ভরি। যদি কারো নিকটে ঐ পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য কিংবা তার সমমূল্যের নগদ অর্থ বা ব্যবসায়ী দ্রব্য থাকে এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয় তাহ'লে তার

মালিককে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯২)*।

উট, গরু, ছাগল ও ভেড়ার নিসাবঃ

উট পাঁচটির কমে যাকাত নেই। ৫টি হ'লে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। গরু ৩০ টির কমে যাকাত নেই। ৩০টি গরুতে ২য় বছরে পড়েছে এমন একটি বাছুর যাকাত দিতে হবে। ছাগল ৪০ টির কমে যাকাত নেই। ৪০ হ'তে ১২০ পর্যন্ত ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। আমাদের দেশে উট, গরু ছাগল ও ভেড়া তেমন ব্যাপকভাবে লালন-পালন করা হয় না বলে এসবের সংক্ষিপ্ত ধারণা উপস্থাপন করা হল মাত্র। উল্লিখিত নিসাব পরিমাণ পশু যদি কারো নিকট থাকে এবং এক বৎসর অতিবাহিত হয় তাহ'লে তার যাকাত দিতে হবে *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭০৪)*। উল্লেখ্য, মহিষের নিসাব গরুর নিসাবের সমান এবং ভেড়ার নিসাব ছাগলের নিসাবের সমান।

যাকাতের হক্বদার

মহান আল্লাহ যেমনভাবে ধন-সম্পদের যাকাত দিতে বলেছেন তেমনি যাকাত ব্যয়ের খাতও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ–

'নিশ্চয়ই ছাদাক্বা হচ্ছে ফক্বীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, অমুসলিমদের অন্ত র জয় করার জন্য, ক্রীতদাস মুক্তিতে, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর রাস্তায় এবং পথিকদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয' *(তওবা ৬০)*। এ ছাদাক্বা বলতে ধন-সম্পদের ফরয যাকাতকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে ৮ শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা প্রত্যেকেই যাকাত পাওয়ার হক্বদার।

আল্লাহর রাস্তায় দান

ইসলামে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছালাতের সঙ্গে যাকাত ছাড়াও দানের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, يُقِيْمُوْنَ الصَّلَوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ–

'তোমরা ছালাত আদায় কর এবং তোমাদেরকে যে রিযিক দেওয়া হয়েছে তা থেকে ব্যয় (দান) কর' *(বাক্বারাহ ৩)*। এ আয়াতে আল্লাহ যে দানের কথা বলেছেন তা ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ–

'আর তোমরা তা হ'তে ব্যয় (দান) কর যা আমি তোমাদেরকে রিযিক্ব হিসাবে দিয়েছি। তোমাদের মৃত্যু আসার পূর্বে' *(মুনাফিক্বূন ১০)*। মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক্ব দিয়েছি তা হ'তে তোমরা দান কর। সেদিন আসার পূর্বে যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না' *(বাক্বারাহ ২৫৪)*।

উল্লিখিত আয়াতগুলিতে আল্লাহ বিশেষভাবে তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে দান করতে বলেছেন, তাদের মৃত্যু আসার পূর্বে। এই দান কারো প্রতি নির্ধারিত পরিমাণ ফরয নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) সাধ্যমত দান করতে বলেছেন। আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি. তোমরা জাহান্নাম হ'তে আত্মরক্ষা কর একটি খেজুর দান করে হ'লেও *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১৪১৭ আধুনিক প্রকাশনী)*। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) গরু, ছাগলের পোড়া খুর অর্থাৎ সামান্য জিনিস হ'লেও দান করতে বলেছেন *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৮৫, তিরমিযী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন)*। কেননা দানের মাধ্যমে মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায় *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১৪১৭ আধুনিক প্রকাশনী)*। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। সেদিন আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন। তন্মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে গোপনে দান করে। সে এমনভাবে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করে তা তার বাম হাত জানতে পারে না। দানের ব্যাপারে সবাইকে সচেষ্ট হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) মহিলাদেরকে দান করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। একদা তিনি এক ঈদের ছালাতের পর মহিলাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা দান কর। কেননা আমাকে অবগত করা হয়েছে যে, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারীরাই হবে। তারা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন অপরাধের কারণে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা অন্যের প্রতি বেশী বেশী অভিশাপ করে থাক এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। তোমরা দ্বীনে অপূর্ণ, জ্ঞানে অপূর্ণ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮)*। এজন্য রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বেশী বেশী দান করতে বললেন। বেলাল (রাঃ) বলেন,

আমি তাদের মধ্যে কাপড় প্রশস্ত করে ধরলাম, তারা তাদের হাতের বালা, আংটি ছোট-বড় সবাই যে যা পারল, সে তা দান করতে লাগল *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৯৭৯ আধুনিক প্রকাশনী)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর যামানার মহিলাগণ যদি এভাবে দান করে থাকেন তাহ'লে তো আমাদেরকে আরো বেশী বেশী দান করতে হবে। মহিলারা তাদের স্বামীর সম্পদ হ'তে দান করতে পারে। স্বামীর সাক্ষাতে হোক কিংবা অগোচরে হোক স্বামীর সম্পদ থেকে দান করলে মহিলা ও তার স্বামী উভয়েই ছওয়াব পাবে। অথচ কারো ছওয়াব কম করা হবে না। তবে স্ত্রীকে লক্ষ রাখতে হবে দানের ক্ষেত্রে যেন বাড়াবাড়ি না হয়ে যায় এবং এর ফলে যাতে করে স্বামীর সংসারে বিপর্যয় নেমে না আসে *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১৪২৫ আধুনিক প্রকাশনী)*। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে নারী সমাজ! তোমরা দান কর যদিও তোমাদের গহনা হ'তেও হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৩৮)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন হ'তে একটি খেজুর পরিমাণ দান করবে আল্লাহ তা কবুল করবেন। আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন। আর আল্লাহ তা ডান হাত দিয়ে কবুল করেন। এরপর আল্লাহ তা দাতার কল্যাণার্থে প্রতিপালন করেন। যেমন তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চা প্রতিপালন করে। অবশেষে সেই ছাদাক্বা পাহাড় সমান হয়ে যায়। (প্রাচীন কালে ঘোড়া ছিল মানুষের প্রিয় সম্পদ। এজন্য ঘোড়ার বাচ্চা পালন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে)।

উত্তম দানঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একটি দীনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় দান করলে একটি দীনার গোলাম আযাদের কাজে খরচ করেছ। একটি দীনার তুমি দরিদ্রকে দান করেছ এবং একটি দীনার তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করেছ। এগুলির মধ্যে যেটি তুমি পরিবারের জন্য খরচ করেছ সেটিই হল ছওয়াবের দিক দিয়ে অধিক বড়' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৩৫)*।

অন্য বর্ণনায় আছে – خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدأ بِمَنْ تَعُوْلُ

'উত্তম দান হ'ল যা স্বচ্ছলতার সাথে দান করা হয়। অর্থাৎ দান করার কারণে যাতে পরিবার-পরিজনের কোন কষ্ট না হয়। তুমি দান শুরু করবে তোমার পরিবার থেকে' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৩৩)*।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللّٰه صـ فَقَالَ لَوْ اَعْطَيْتَهَا اَخْوَالِكَ كَانَ اَعْظَمَ لاَجْرِكَ

মাইমুনা বিনতু হারেছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় একটি দাস মুক্ত করলেন। অতঃপর তা রাসূলকে জানালেন। তিনি বললেন, যদি তুমি তা তোমার ভাইদের দান করতে তাহ'লে বেশী ছওয়াব হ'ত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৩৯)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন দানের ছওয়াব বেশী। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সুস্থ ও কৃপণ অবস্থায় তোমার ছাদাক্বা করা। যখন তুমি দারিদ্রের আশংকা করবে এবং ধনী হওয়ার আশা রাখবে এমতাবস্থায় দান করা অতি উত্তম *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১৪২৫; আধুনিক প্রকাশনী, হা/১৩৩৪)*।

عَنْ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُوكَّى فَيُوكَّى عَلَيْكَ–

আসমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন যে, সম্পদ কমে যাওয়ার ভয়ে ছাদাক্বা করা অর্থাৎ দান-খয়রাত বন্ধ করবে না। অন্যথায় তোমার জন্যও আল্লাহ কর্তৃক দান বন্ধ করে দেওয়া হবে' *(বঙ্গানুবাদ বুখারী, হা/২৪৩৩; আধুনিক প্রকাশনী হা/১৩৪০)*।

দান করার পর বলে বেড়ানোঃ

আল্লাহর তা'আলার বাণী,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لاَ يَتَّبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوا مَنًّا ولاَ اَذًى–

'প্রকৃতপক্ষে মুমিন তারাই যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ হ'তে ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না' *(বাক্বারাহ ২৬২)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এমনভাবে ছাদাক্বা করল যে, তার ডান হাত যা ব্যয় করেছে বাম হাত তা জানে না।

আল্লাহর বাণী, তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তাহ'লে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে দান কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও তবে তোমাদের জন্য তা আরো ভাল' *(বাক্বারাহ ২৭১)*।

গোপনে দানের অনেক ফযীলত ও গুরুত্ব রয়েছে। পক্ষান্তরে লোক দেখানো দান করলে সে দান কোন কাজে আসবে না। বরং তা গোনাহের কারণ হবে *(বাক্বারাহ ২৬৪)*। আর যে ব্যক্তি কাউকে কোন কিছু দান করার পর কোন কারণে খোটা দেয় সে জান্নাতে যেতে পারবে না *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ)*। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলবেন না। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হচ্ছে যারা দান করে খোটা দেয়।

যারা ছাদাক্বা করতে অক্ষম বা অসমর্থ তাদের উচিত মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করা ও ভাল কথা বলা। কেননা প্রত্যেক ভাল কথায় একটি ছাদাক্বার সমান ছওয়াব রয়েছে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধও একটি ছাদাক্বা। তেমনি (১) সুবহ:নাল্লা-হ (২) আলহ:মদুলিল্লা-হ (৩) লা-ইলাহা ইল্লাল্ল-হ (৪) আল্ল-হু আকবার বলাতে ৩৬০ টি ছাদাক্বা করার মত ছওয়াব রয়েছে। অতএব আমরা যারা কর্মব্যস্ত ও অভাবী তাদের উচিত কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাসবীহগুলি বলার অভ্যাস করা।

ছিয়ামের আলোচনা

ছিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। এর জন্য সীমাহীন প্রতিদান রয়েছে। এটি এমন এক ইবাদত যার প্রতিদান আল্লাহ স্বহস্তে প্রদান করবেন। ছিয়াম ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য কোন ইবাদত নেই, যার প্রতিদান আল্লাহ নিজ হাতে দিবেন। ছিয়াম সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ তথা সংজ্ঞা জানা আবশ্যক।

সংজ্ঞাঃ

صوم একবচন, বহুবচনে صيام এর অর্থ বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহর নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সহবাস এবং যাবতীয় অশ্লীল কথা ও কাজ হ'তে বিরত থাকাকে ছিয়াম বলে। ছিয়ামকে রোযা বলা হ'লে এর অর্থ বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্য রোযা বলা ঠিক নয়। রোয অর্থ উপবাস। আর উপবাস অর্থ পানাহার হ'তে বিরত থাকা। যা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল ধর্মের লোকেরা পালন করে থাকে। এই উপবাসে অশ্লীল কথা ও কর্ম পরিহার করা এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার কোন বিধান নেই। সুতরাং ছিয়াম ও রোযার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

এছাড়া ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলির নাম বাংলা বা অন্য কোন ভাষায় না বলে আরবীতে বলাই উত্তম। কেননা বাংলা বা অন্য কোন ভাষায় বললে ঐ ইবাদতের মূল অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ছিয়াম ইসলামের মৌলিক ফরয ইবাদতঃ

ইসলামের মৌলিক ইবাদত সমূহের মধ্যে ছিয়াম একটি। এটি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবান ধনী-দরিদ্র নারী-পুরুষ সকলের উপর ফরয।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য ছিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি ছিয়াম ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হ'তে পার' *(বাক্বারা ১৮৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

'তোমাদের মধ্যে যে এই মাসটিকে পাবে সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, 'ইসলাম পাঁচটি খুটির উপর প্রতিষ্ঠিত- (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। (৩) দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা (৩) নির্ধারিত মালের যাকাত আদায় করা (৪) সামর্থ থাকলে হজ্জ করা এবং (৫) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা।

এই ছিয়াম কেবল উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর ফরয নয় বরং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উম্মতের উপরও এই ছিয়াম ফরয ছিল। তবে তাদের উপর কোন মাসে কত দিন ছিয়াম ফরয ছিল এসম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর দ্বিতীয় হিজরীতে ছিয়াম ফরয হয়।

ছিয়ামের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যঃ

ছিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। ছিয়ামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ–

'যখন রামাযান মাস আসে তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৬০)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সমস্ত শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়' *(সিলসিলা ছহীহা হা/২২০৭, ১৩০৭)*।

عن أبي هريرة رضـ قال قال رسول الله ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান মাস আসে তখন রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬০)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রামাযান মাস এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসে জান্নাতের দরজা খোলা থাকে, জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে এবং আল্লাহর রহমতের দরজা খোলা থাকে। পূর্ণমাস আল্লাহর এক বিশেষ দয়া ও রহমত বর্ষণ হয়। প্রকাশ থাকে যে, রামাযান মাসকে তিন ভাগ করার হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, তাহক্বীক মিশকাত হা/১৯৬৫)*।

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لاَ يَدْخُلُهَا إلاَّ الصَّائِمُوْنَ–

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তার একটি দরজার নাম রাইয়ান। ছিয়ামপালনকারী ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৭; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬১)*।

عن أبي هريرة رضـ قال قال رسول الله ﷺ كُلُّ عَمَلِ بْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّهُ تَعَالَى اِلاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي اِمْرَأٌ صَائِمٌ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের নেক আমল বাড়ানো হয়ে থাকে। পত্যেক নেক আমল দশগুণ হ'তে সাত শত গুণ পর্যন্ত পৌঁছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তবে ছিয়াম ব্যতীত। কারণ ছিয়াম আমারই জন্য পালন করা হয় এবং তার প্রতিদান আমিই দিব। সে আমার জন্য স্বীয় প্রবৃত্তি ও খাদ্য-পানি ত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি প্রধান আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি জান্নাতে আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয়ই ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের খুশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। ছিয়াম হচ্ছে মানুষের জন্য জাহান্নাম হ'তে রক্ষার ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো ছিয়াম পালনের দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলে আমি একজন ছিয়াম পালনকারী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬৩)*।

রামাযান মাসে এমন একটি রাত আছে যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম *(ক্বদর ৩)*। এ মাসে একজন আহ্বানকারী মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকে এবং অকল্যাণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। হাদীছে এসেছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ .... وَيُنَادِيُ مُنَادٍ: يَابَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযান মাসে আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে হে কল্যাণের অন্বেষণকারী আরও কল্যাণ অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হও। হে মন্দের অন্বেষণকারী মন্দ অন্বেষণ করা হ'তে থেমে

যাও। আল্লাহ এ মাসে বহু লোককে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দেন। আর এরূপ প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৯৬০; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬৫)*।

উল্লিখিত হাদীছগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, ছিয়ামের মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ছিয়াম পালনের মাধ্যমে মানুষ জান্নাতে যেতে পারে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়। অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা যায়, ঝগড়া-ঝাটি থেকে বেঁচে থাকা যায়। পরহেযগারিতা অর্জন করা যায়। ক্বিয়ামতের দিন ছিয়াম পালনকারীর জন্য ছিয়াম আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে যা কবুল করা হবে।

عن عبد الله بن عمرو رضـ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يُشَفَّعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ إِنِّيْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتَ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়াম এবং কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লহার নিকট বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে প্রতিপালক আমি তাকে দিনে তার খাদ্য ও প্রবৃত্তি হ'তে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা হ'তে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতএব উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৯৬৩; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬৬)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর ছিয়ামঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ছিয়াম পালন করতে থাকতেন তখন আমরা বলতাম যে, তিনি আর ছিয়াম ছাড়বেন না। আবার যখন ছিয়াম ছাড়তেন তখন আমরা বলতাম যে, তিনি আর ছিয়াম রাখবেন না। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে রামাযান ছাড়া পূর্ণমাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান ছাড়া অন্য কোন মাসে এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ وَاَفْضَلُ الصَّلَوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَوةِ اللَّيْلِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘রামাযানের পর আল্লাহর মাস মুহাররমের ছিয়ামই শ্রেষ্ঠ এবং ফরয ছালাতের পর রাতের ছালাতই শ্রেষ্ঠ ছালাত’ *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৪১)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ اِلاَّ هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عَشُوْرَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِيْ شَهْرُ رَمَضَانَ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে এই দিন অর্থাৎ আশুরার দিন এবং এই মাস অর্থাৎ রামাযান মাস ব্যতীত কোন দিন বা মাসে ছিয়াম রাখার প্রতি এত খেয়াল করতে এবং অন্যান্য দিন সমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে দেখিনি’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৪২)*।

অন্য এক বর্ণনায় আছে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে আশুরার দিন ছিয়াম পালন করার নির্দেশ দিলে ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এই দিনকে ইহুদী ও নাছারারাও সম্মান করে। তখন রাসূল বললেন, ‘আমি যদি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহ’লে নবম তারিখেও ছিয়াম পালন করব’ *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৪৩)*।

মুহাররম মাসের ৯ম ও ১০ম তারিখে দু’টি ছিয়াম রাখাকে আশুরার ছিয়াম বলে। এই ছিয়ামের অত্যধিক ফযীলত রয়েছে। আশুরার ছিয়াম পালন করলে এক বছর পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৪৬)*।

عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتبَعَهُ سِتًّا مِّنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ–

আবু আইউব আনছারী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি রাসূল (ছাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করল, অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন পূর্ণ এক বছর ছিয়াম পালন করল’ *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৪৯)*।

অনেকের ধারণা কারো যদি রামাযানের ছিয়াম ছুটে যায় তাহ’লে আগে কাযা আদায় করে পরে শাওয়ালের ছিয়াম পালন করতে হবে। এ ধারণা ঠিক নয়।

কারণ রামাযানের কাযা ছিয়াম পরবর্তী বছর রামাযান মাস আসার পূর্বে বছরের যে কোন সময় আদায় করা যাবে কিন্তু শাওয়ালের ছিয়াম কেবল শাওয়াল মাসেই রাখতে হবে। এজন্য কারো রামাযানের ছিয়াম ছুটে গেলেও শাওয়ালের ছিয়াম আগে রেখে পরে রামাযানের কাযা ছিয়াম রাখা উত্তম। আবার শাওয়ালের নফল ছিয়াম একাধারে ছয়টা রাখা যাবে না, মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে ছয়টা ছিয়াম পূরণ করতে হবে, এধারণাও ঠিক নয়। কেননা এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। সুতরাং যার যেভাবে সুবিধা সে সেভাবে এ ছিয়াম রাখতে পারে। এক্ষেত্রে ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই।

অন্য এক বর্ণনায় আছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করা সারা বছর ছিয়াম পালন করার সমান। প্রত্যেক মাসের **১৩, ১৪, ১৫** এই তিন দিন ছিয়াম রাখার কথা হাদীছে এসেছে। রাসূল (ছাঃ) আবু যারকে বললেন, 'তুমি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখবে যখন মাসের **১৩, ১৪, ১৫** তারিখ হবে' *(তিরমিযী, নাসাঈ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৯)*।

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আরাফার দিন ছিয়াম পালন করলে, এক বছর আগের এবং এক বছর পরের সমস্ত ছগীরা গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। যারা হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কায় যাবে তারা ব্যতীত অন্যরা এই দিন ছিয়াম পালন করবে। কেননা যারা হজ্জে গমন করে তাদের জন্য এই ছিয়াম নয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالخَمِيْسِ فَاُحَبُّ أَنْ يُّعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল সমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। অতএব আমি চাই যে, আমার আমল পেশ করা হোক আমার ছিয়াম রত অবস্থায়' *(তিরমিযী, নাসাঈ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৮)*।

হাফছাহ (রাঃ) বলেন, চারটি বিষয় এমন যেগুলি রাসূল (ছাঃ) কখনো ছাড়তেন না। আশুরার ছিয়াম, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের ছিয়াম, প্রত্যেক মাসে তিন দিন ছিয়াম এবং ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত *(নাসাঈ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত*

হা/১৯৭১)। অত্র হাদীছে যিলহজ্জ মাসে চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দিন সমূহের মধ্যে এই দশদিনের আমল আল্লাহর নিকট প্রিয়তর। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে আর ফিরে আসে না। অর্থাৎ শহীদ হয় তার কথা ভিন্ন *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৭৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের উচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। তাই এই দিনগুলি ছালাত, ছিয়াম, যিকর-আযকার সহ বিভিন্ন ইবাদতের মধ্যে কাটানো উচিত *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৫ম খণ্ড, হা/১৪৭৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَصُوْمُ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اِلاَّ أَنْ يَّصُوْمَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُوْمَ بَعْدَهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন শুধু জুম'আর দিনে ছিয়াম না রাখে, এ দিনের পূর্বে বা পরে ছিয়াম পালন ব্যতীত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৩)*।

অন্য বর্ণনায় আছে, রাত্রি সমূহের মধ্যে শুধু জুম'আর রাত্রিকে ছালাত আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট করো না এবং দিন সমূহের মধ্যে কেবল জুম'আর দিনকেই ছিয়াম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করো না। যদি ঐ দিন তোমাদের ছিয়াম রাখার তারিখে না পড়ে *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৪)*। তবে কারো যদি কোন কারণে ছিয়াম আদায়ের ক্ষেত্রে জুম'আর দিন এসে যায় তাহ'লে কোন অসুবিধা নেই।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ'তে সত্তর বছরের পথ দূরে করে দিবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৫; সিলসিলা ছহীহা হা/২২৬৭/২৫৬৫)*।

উল্লিখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা জানা যায় যে, রামাযান মাসের ফরয ছিয়াম ছাড়াও রাসূল (ছাঃ) নির্দিষ্ট কিছু দিনে ছিয়াম পালন করতেন। তিনি বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছিয়াম রাখলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৫)*।

এক নযরে রাসূল (ছাঃ)-এর ছিয়ামঃ

(১) শা'বান মাসের অধিক ছিয়াম (২) শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম (৩) প্রতি মাসে তিনটি ছিয়াম তথা আইয়ামে বীযের ছিয়াম (৪) সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম (৫) আরাফার দিন অর্থাৎ হজ্জের দিন হাজীগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য ছিয়াম (৬) মুহাররম মাসের ৯ম ও ১০ম তারিখের ছিয়াম (৭) যিলহজ্জ মাসে কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত ছিয়াম রাখা যায়।

উল্লেখ্য, শুধু শুক্রবারে এবং দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল আযহার পরের দু'দিন রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া শা'বান মাসের ১৫ তারিখকে উদ্দেশ্য করে ছিয়াম, ছালাত, যিকর-আযকার, ইবাদত, কবর যিয়ারত, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। শবে বরাতের স্বপক্ষে আলেমগণ যেসব হাদীছ ও আছার পেশ করেন তার সবই ভিত্তিহীন, জাল-যঈফ।

মুসাফির বা ভ্রমণকারী ও অসুস্থ ব্যক্তির ছিয়ামঃ

মহান আল্লাহ কোন ক্ষেত্রে কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। তিনি বলেন, يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَى وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَى

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাথে কঠোরতা আরোপ করতে চান না বরং তিনি তোমাদের প্রতি সহজ করতে চান' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। ইবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ বান্দাদের প্রতি কোন জোর-জবরদস্তিমূলক কোন নির্দেশ করেননি। তিনি বান্দাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং প্রত্যেকে যাতে নিজের সুযোগ-সুবিধামত আদায় করতে পারে তার যথোপযুক্ত পদ্ধতিও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন সফরে থাকলে বা অসুস্থ হ'লে অনেকের পক্ষে ছিয়াম পালন অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আল্লাহ অসুস্থ ও সফরকারীর জন্য অন্য সময়ে ছিয়াম পালনের সুযোগ দিয়ে বান্দাদের প্রতি তিনি ইহসান করেছেন। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ–

'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোগাক্রান্ত থাকে অথবা সফরে থাকে তাহ'লে সে যেন অন্য দিন সমূহে এই সংখ্যা পূর্ণ করে *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। অর্থাৎ সে যেন ঐ সময়ে ছিয়াম পালন না করে। অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হ'লে কিংবা সফরকারী সফর শেষ করে পরবর্তীতে এই ছিয়াম পালন করবে। তবে ভ্রমণকারী ইচ্ছা করলে সফর অবস্থায়ও ছিয়াম রাখতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে সে ছিয়াম ছেড়েও দিতে পারে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯১২)*। ফরয, নফল উভয় ছিয়ামের ক্ষেত্রে একই বিধান। সফর অবস্থায় ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরবর্তীতে কাযা আদায় করতে হবে। অসুস্থ, গর্ভবতী ও দুধ পানকারিনী মহিলার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। ইচ্ছা করলে তারা ছিয়াম রাখতে পারে কিংবা ছেড়ে দিতে পারে। পরবর্তীতে সুবিধামত সময়ে কাযা আদায় করতে হবে। তবে গর্ভবতী ও সন্তানকে দুধপানকারিণী মহিলা অন্যের দ্বারা পালন করাতে পারে।

উল্লেখ্য, যদি কোন ব্যক্তি এমন অসুস্থ হয় যে, তার আর সুস্থ হওয়ার আশা নেই তাহ'লে তার পক্ষ থেকে ফিদইয়া দিতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক ছিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করতে হবে।

সফর অবস্থায় আত্মার উপর যুলুম করে ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। মক্কা বিজয়ের বছর নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন এবং ছিয়াম রাখলেন। রাসূল (ছাঃ) কুরাউল গামীম নামক স্থানে পৌঁছে এক পিয়ালা পানি চাইলেন। তিনি পানির পাত্র উপরে উঠিয়ে ধরলেন যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়। তিনি পানি পান করে ছিয়াম ভঙ্গ করলেন। রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হ'ল যে, এখনো কিছু লোক ছিয়াম রেখেছে। রাসূল (ছাঃ) শুনে বললেন এরাই নাফরমান, এরাই নাফরমান। অন্য বর্ণনায় আছে, হামযা ইবনু আমর আসলামী (রাঃ) একবার রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি সফরে ছিয়াম পালন করতে সক্ষম হই এবং ছিয়াম রাখি তাহ'লে আমার কি কোন গুনাহ হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, সফর অবস্থায় ছিয়াম না রাখা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ। যে তা গ্রহণ করবে তার জন্য এটা কল্যাণকর হবে। আর যদি কেউ ছিয়াম রাখতে পসন্দ করে তাহ'লে তার কোন গুনাহ হবে না' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৩১)*।

এক হাদীছে সফর অবস্থায় ছিয়াম না ভাঙ্গার কারণে ছাহাবীদেরকে নাফরমান বললেন এবং অন্য হাদীছে আছে, তিনি বললেন, সফরে ছিয়াম রাখলে কোন গুনাহ নেই। এ হাদীছ দু'টির মাঝে বাহ্যত বৈপরিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ হাদীছ দু'টির মাঝে কোন বৈপরিত্ব নেই। কারণ উপরের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল নিজে উপস্থিত থেকে তিনি ছিয়াম ভঙ্গ করলেন কিন্তু যারা তাঁর অনুসরণ করেনি তাদেরকে তিনি নাফরমান বলেছেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হাদীছে রাসূল সাধারণ সফরের কথা বলেছেন। এখানে সফরকারী ইচ্ছা করলে ছিয়াম রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে ভঙ্গ করতে পারে। এটা সফরকারীর উপর নির্ভরশীল।

ছিয়াম অবস্থায় করণীয়ঃ

ছিয়াম কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পালনীয় একটি দৈহিক ও মানসিক ইবাদত। অন্যান্য ইবাদতের মতো এতে লৌকিকতার কোন

অবকাশ নেই। কেননা মানুষ লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে সারাদিন পানাহার ও যাবতীয় ভোগের সামগ্রী ত্যাগ করে না বরং আল্লাহর ভয়েই মানুষ এসব থেকে বিরত থাকে। এজন্য সে ছিয়ামের পবিত্রতা রক্ষা করে যথাযথভাবে ছিয়াম পালন করতে সচেষ্ট হয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও অশ্লীল কাজ পরিহার করল না, তার পানাহার পরিত্যাগ করাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই' *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯০২)*। অর্থাৎ তার খাওয়া ও না খাওয়া উভয়েই সমান। কেননা তার ছিয়াম হয় না। অন্য বর্ণনায় আছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ .... وَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلِيَقُلْ أَنِّيْ امْرأٌ صَائِمٌ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, '...যখন তোমাদের কারো ছিয়াম পালনের দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল

না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলে, আমি একজন ছিয়াম পালনকারী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৬৩)*।

অত্র হাদীছ দু'টি দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর ইবাদত সমূহের মধ্যে ছিয়াম এমন একটি ইবাদত যা মানুষকে অন্যায়-অনাচার, পাপাচার, মিথ্যা ও অনর্থক কথা এবং অশ্লীল ও গর্হিত কাজ, হৈচৈ, শোরগোল, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি হ'তে বিরত রাখে। ছিয়াম পালনকারী যেমন পানাহার সহ যাবতীয় ভোগের সামগ্রী হাতের কাছে পেয়েও কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা হ'তে বিরত থাকে তেমনি ঐ সব অপকর্ম থেকেও তাকে বিরত থাকতে হবে। কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকলে ছিয়াম পালন হয় তা নয় বরং উল্লিখিত কর্মগুলি থেকে বিরত না থাকলেও ছিয়াম আদায় হয় না। কেননা ঐ সব কর্ম করতে থাকলে ছিয়ামের আসল উদ্দেশ্য সফল হয় না। ফলে সারাদনি শুধু না খেয়ে থাকা হয় কিন্তু কোন ছওয়াব লাভ হয় না। তাই ছিয়াম পালনের সাথে সাথে যাবতীয় অপকর্ম পরিহার করতে হবে। আর এর মধ্যেই ছিয়ামের স্বার্থকতা।

সুবহে ছাদিকের পূর্বে স্ত্রী সহবাসের কারণে অপবিত্রাবস্থায় যদি কারো সকাল হয়ে যায় তাহ'লে তার ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯০৪)*।

মিসওয়াক করলে, কুলি করার পর মুখের থুথু গিলে ফেললে, চোখে সুরমা লাগালে, স্ত্রীর শরীরের সাথে শরীর লাগলে, অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হ'লে, শরীরের কোন অঙ্গ কেটে রক্ত বের হ'লে, খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কেবল রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ইনজেকশন লাগালে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না। স্বপ্নদোষ হ'লেও ছিয়াম নষ্ট হয় না।

নফল ছিয়াম বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই ভঙ্গ করা যায় কিন্তু রামাযান মাসের ফরয ছিয়াম গ্রহণযোগ্য শারঈ কারণ (রোগ-ব্যাধি, সফর) ছাড়া ভঙ্গ করা যায় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ যদি কোন কারণ ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে ছিয়াম ভঙ্গ করে তাহ'লে তাকে সেই ছিয়াম পূরণ করতে হবে। তবে সারা জীবন ছিয়াম পালন করলেও উক্ত ছিয়ামের ফযীলত লাভ করতে পারবে না। যদি কেউ স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে রামাযানের ছিয়াম ভঙ্গ করে তবে তাকে ঐ ছিয়ামের কাফফারা আদায় করতে হবে। ছিয়ামের কাফফারা হচ্ছে সামর্থ্য থাকলে একটি দাস মুক্ত

করা অথবা একাধারে দুই মাস ছিয়াম পালন করা। তাও সম্ভব না হ'লে ৬০ মিসকীনকে খাদ্য দান করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯০৭)*।

রামাযানের ফরয ছিয়াম কাযা হয়ে গেলে তা সুবিধামত বছরের যে কোন সময়ে আদায় করা যায়। তবে সাথে সাথে আদায় করাই উত্তম। কেননা মানুষের মৃত্যুর কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোন সময় মৃত্যু আসতে পারে। তাই চেষ্টা করতে হবে কাযা ছিয়াম যত দ্রুত সম্ভব আদায় করা।

কারো জীবদ্দশায় অজ্ঞান অবস্থায় দুই চার দিনের ছালাত ছুটে গেলে এবং ঐ অবস্থায় মারা গেলে উক্ত ছালাতগুলি যেমন তার ওয়ারেছদের মধ্য হ'তে কাউকে আদায় করা লাগে না। তেমনি ছিয়ামের ক্ষেত্রেও তাই।

শা'বানের শেষে রামাযানের দু'একদিন পূর্বে ছিয়াম রাখা যাবে না। তবে কেউ যদি এসময়ে ছিয়াম রাখতে অভ্যস্ত হয় অর্থাৎ মাস শেষে ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত হয় কিংবা মানত বা কাযা ছিয়াম থাকে তাহ'লে তা আদায় করতে পারে *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১৯১৪)*।

রামাযান মাসে বেশী দান-খয়রাত করা, ছালাত আদায় করা, যিকির-আযকারের মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করা উত্তম। কেননা রামাযান মাসের ফযীলত অন্যান্য মাসের চেয়ে অনেক বেশী। এ মাসে একটি সৎ আমলের ছওয়াব অন্য মাসের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। তাছাড়া এ মাসে এমন একটি রাত আছে যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে বেশী বেশী দান করতেন *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/১৯০২)*।

সাহারী ও ইফতারঃ

রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِيْ السَّحُوْرِ بَرَكَةٌ–

'তোমরা সাহারী খাও। কেননা সাহারীতে বরকত আছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৮৫)*। অন্য বর্ণনায় আছে, আমাদের ছিয়াম ও আহ'লে কিতাবের ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হ'ল সাহারী খাওয়া *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৮৬)*। সাহারী না খেলেও ছিয়াম সিদ্ধ হবে তবে ছিয়ামের নিয়ত করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, খাদ্য ও পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় কেউ যদি আযান শুনতে পায় তাহ'লে প্রয়োজন পূরণ না করা পর্যন্ত সে যেন পাত্র

রেখে না দেয়। যদি এমন হয় যে, খাওয়া শুরু করা হয়নি ইতিমধ্যে আযান হয়ে গেল তবুও খানা খাওয়া যাবে। এতে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না।

ইফতার তাড়াতাড়ি করাই শরী'আত সম্মত। অর্থাৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হবে। হাদীছে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারারা ইফতার দেরীতে করে' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক তাড়াতাড়ি এবং সাহারী দেরীতে করতেন *(নায়লুল আওত্বার, কায়রো:১৯৭৮ ৫/২৯৩ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট ঐ বান্দা অধিক প্রিয় যে তাড়াতাড়ি ইফতার করে' *(তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৯৮)*। অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন ততদিন বিজয়ী থাকবে যতদিন মানুষ শিঘ্রই ইফতার করবে' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৯৮)*।

খেজুর দ্বারা ইফতার করা উত্তম। খেজুর না থাকলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। খেজুর দ্বারা ইফতার করলে যে ছওয়াব বেশী হবে তা নয়। তবে খেজুর দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত। কারো নিকট খেজুর বা পানিও যদি না থাকে তবে যা আছে তা দিয়ে ইফতার করতে হবে। ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তিকে ইফতার করালে অনেক ছওয়াব রয়েছে। কোন ব্যক্তি কোন ছায়েমকে ইফতার করালে সে ঐ ছায়েমের সমান ছওয়াব পাবে। এক্ষেত্রে কারো ছওয়াব কম করা হবে না *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৯২)*।

ইফতারের দো'আ

রাসুল (ছাঃ) যখন ইফতার করতেন তখন বলতেনঃ

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ–

উচ্চারণঃ *যাহাবায য:মা-উ ওয়াবতাল্লাতিলি 'উরূক, ওয়া ছাবাতাল আজ্‌রু ইংশা-আল্লা-হু।*

অর্থঃ ‘পিপাসা দূর হ’ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ’ল এবং নেকী নির্ধারিত হ’ল ইনশাআল্লাহ’ *(আবুদাঊদ, মিশকাত, হা/১৯৯৩,‘ছিয়াম’ অধ্যায়, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৯৬)*।

অন্য বর্ণনায় আছে রাসুল (ছাঃ) ইফতারের সময় বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِىْ–

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা বিরহ:মাতিকাল্লাতী ওয়াসি‘আত কুল্লা শাইয়িন আং তাগফিরা লী।*

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! তোমার যে রহমত সকল কিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তার দ্বারা প্রার্থনা জানাই, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও’ *(ইবনু মাজাহ, পৃঃ ১২৫, সনদ ছহীহ-ইবনু হাজার)*। উল্লেখ্য যে, দেশে প্রচলিত اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ আবুদাউদ হা/২৩৫৮ ‘ছিয়াম’ অধ্যায়; যঈফ ইবনু মাজাহ ১৩৫ পৃঃ)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তিন শ্রেণীর লোকের দো‘আ ফেরত দেন না। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হচ্ছে ছিয়াম পালনকারী, যতক্ষণ সে ইফতার না করে’ *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৩২ সনদ ছহীহ)*।

ছিয়ামের উপকারিতাঃ

ছিয়ামের দ্বারা পরকালীন মুক্তি যেমন লাভ করা যাবে তেমনি ইহকালীন জীবনেও ছিয়ামের অনেক উপকারিতা রয়েছে। ছিয়াম পরিপাক যন্ত্র ও পাকস্থলীকে সর্বদা কাজ করা থেকে বিরতি দান করে এবং শরীরের বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণে সহায়তা করে। ধূমপায়ীকে দিনের বেলা ধুমপান থেকে বিরত রাখে। এভাবে আস্তে আস্তে ধূমপান পরিহার করা তার জন্য সহজসাধ্য হয়। ছিয়াম মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে। ফলে মানুষ নিজেকে অন্যায় কাজ হ’তে রক্ষা করতে পারে। ছিয়ামের মাধ্যমে মানুষ দরিদ্র ও অভাবীদের নিদারুণ ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে তাদের প্রতি সদয় হ’তে পারে।

হজ্জ

হজ্জের সংজ্ঞাঃ

হজ্জের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করা। আর শরী'আতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট কিছূ নিয়ম-কানূনের মাধ্যমে বাইতুল্লাহর তওয়াফের সংকল্পকে হজ্জ বলে।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ্জ অন্যতম যা, অস্বীকার করা কুফুরী। তবে সকলের উপর হজ্জ ফরয নয়। হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে মক্কায় যাওয়া আসার সামর্থ্য থাকা অন্যতম। আল্লাহ বলেন, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً.

'মানুষের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয, যার রাস্তা খরচ বহনের সামর্থ্য আছে' *(আলে ইমরান ৯৭)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ পথকেই শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। পথের সামর্থ্য বলতে প্রথমত যার বাইতুল্লাহ পর্যুন্ত যাওয়া আসার অর্থ ও সামর্থ্য রয়েছে, তার জন্য হজ্জ ফরয। দ্বিতীয়ত পথে যার কোন শত্রুর ভয় বা শাসকের পক্ষ থেকে কোন সমস্যা নেই তার জন্য হজ্জব্রত পালন করা ফরয।

হজ্জব্রত পালনের ব্যাপারে বয়সের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। ছালাত, ছিয়ামের ক্ষেত্রে যেমন বয়স নির্ধারিত হয়েছে, হজ্জের ক্ষেত্রে তেমনটি নেই। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত যে কোন বয়সের নারী-পুরুষ সামর্থ্য থাকলে হজ্জব্রত পালন করতে পারে। তবে শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের হজ্জের ছওয়াব তার পিতা-মাতা বা অভিভাবক পাবে *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৯৬)*।

কোন ব্যক্তি ফরয ছালাত ছুটে যাওয়া অবস্থায় মারা গেলে তার পক্ষ থেকে ঐ ছালাত আদায় করার কোন বিধান নেই। কিন্তু কারো উপর যদি হজ্জ ফরয হয়ে থাকে এবং সে যদি অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে আদায় করতে না পারে কিংবা মারা যায়, তাহ'লে তার পক্ষ থেকে তার আত্মীয়-স্বজন হজ্জব্রত পালন করতে পারবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৯৭)*।

হজ্জের ফরযিয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, হজ্জ কেবল সম্পদশালীদের উপর ফরয, দরিদ্রদের উপর ফরয নয়। তবে কোন দরিদ্র ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তা আদায় করতে পারে।

মহিলাদের জন্য হজ্জ ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে পাথেয় থাকার সাথে সাথে হজ্জ সফরের জন্য স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তি যেমন পিতা, ছেলে, ভাই থাকা আবশ্যক, যারা তার সফরসঙ্গী হ'তে পারে। স্বামী বা মাহরাম সফরসঙ্গী ব্যতীত মহিলাদের উপর হজ্জ ফরয নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৯৯, ২৪০১)*।

হজ্জের ফযীলতঃ

হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যার প্রতিদান বা পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত। যে ব্যক্তি হালাল পন্থায় উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে যথাযথ নিয়মে হজ্জ পালন করে, সে সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়। হজ্জের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হ'লো-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ওমরা থেকে অপর ওমরা পর্যন্ত কাফফারা স্বরূপ এবং কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮; বাংলা মিশকাত হা/২৩৯৪)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজ্জ করল এবং এ হজ্জের মধ্যে কোন অশ্লীল কথা ও কর্মে লিপ্ত হল না, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৭; বাংলা মিশকাত হা/২৩৯৩)*।

عن أبي هريرة رضـ قال سُئِلَ رسول الله ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانُ بِاللّهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল তারপর কি? রাসূল বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কি? তিনি বললেন, কবুলকৃত হজ্জ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৬)*।

জাহান্নামী নারী

পুরুষ-মহিলা প্রত্যেকে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য পরকালে জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে যাবে। তাই যেসব নারী ইসলামী আদর্শ মেনে চলে না

তাদের জন্য পরকালে ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِيْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِيْ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ.

'যেসব লোক পসন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা প্রসার লাভ করুক তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে' *(নূর)*।

অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামী শরী'আত বহির্ভূত কাজ এবং নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতাই হচ্ছে জাহান্নামে যাওয়ার মূল কারণ।

যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সরাসরি জাহান্নামে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাদের মধ্যে বেপর্দা নারী অন্যতম। বেপর্দা নারীর কারণে অনেক সময় ঈমানদার পুরুষদের ঈমান নষ্ট হয়। এদের কারণেই অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামে যাবে। নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى–

'তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান কর। জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না' *(আহযাব ৩৩)*।

বেপর্দা নারীদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ সমস্ত মহিলা যারা কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদের মাথা উষ্টের ঝুঁকে পড়া কাঁধের মত। অর্থাৎ তারা মাথার চুলকে এমনভাবে উচু করে খোপা বাঁধে যা উটের কাঁধের মত দেখায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধও তারা পাবে না। যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে।

কাপড় পরা সত্ত্বেও তারা উলঙ্গ। কারণ তাদের কাপড় এতই পাতলা যে তাদের সর্বাঙ্গ দেখা যায় কিংবা এমন আট-সাট বা টাইট ফিটিং পোশাক পরে, যে তাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সহজেই পরিদৃষ্ট হয় এবং বিশেষ অঙ্গের প্রতি পুরুষের দৃষ্টি পড়ে। ফলে যুবকরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা করেছেন, তাদের জন্য জান্নাত হারাম।

নারীরা হচ্ছে ঢেকে রাখার বস্তু। কাজেই তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। বরং তাদের উচিত নিজেরদেরকে আবৃত করে রাখা। আল্লাহ বলেন, وَلاَيُبْـدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا–

'তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তবে যা স্বভাবতই প্রকাশ হয়ে পড়ে তার কথা স্বতন্ত্র' *(নূর ৩১)*।

অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলাদের পোশাক হ'তে হবে ঢিলাঢালা ও মোটা কাপড়ের যাতে তার শরীরের উচু-নীচু অঙ্গগুলি বাহির থেকে বোঝা না যায়। নারীর সমস্ত শরীরই ঢেকে রাখা আবশ্যক। তবে ঐসব অঙ্গ না ঢাকলেও অসুবিধা নেই যেসব অঙ্গ স্বভাবতই প্রকাশ পায়। যেমন মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা ইত্যাদি। অনেক বিদ্বান বলেন যে, মুখমণ্ডল হচ্ছে মহিলাদের সৌন্দর্যের মূল। অতএব মুখমণ্ডলও ঢেকে রাখতে হবে *(ইসলামে হালাল হারামের বিধান, পৃঃ...)*।

আল্লাহ বলেন, وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُلَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ–

'আর তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না তাদের স্বামী ও পিতাদের ছাড়া অন্য কারো সামনে' *(নূর ৩১)*। অত্র আয়াতে মুসলিম মহিলাদেরকে স্বামী এবং নির্দিষ্ট কয়েকজন পুরুষ ব্যতীত অন্য কারো সামনে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা যায়-

(১) পিতা, দাদা, নানা, স্বামীর পিতা, দাদা ও নানা।

(২) নিজ পুত্র, পৌত্র, পৌত্রী, নাতি-নাতনী।

(৩) নিজ ভাই, বৈমাত্রেয় ও বৈপিতৃয় ভাই।

(৪) আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগনা।

(৫) অতিবৃদ্ধ যাদের যৌন চাহিদা নেই।

(৬) যেসব অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি যার কোনরূপ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

(৭) আপন চাচা ও মামা। তারা হচ্ছে পিতৃতুল্য।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পুরুষরা একে অপরের লজ্জাস্থানের প্রতি তাকাবে না। তেমনি নারীরাও পরস্পরের লজ্জাস্থানের প্রতি তাকাবে না। দু'জন পুরুষ একই কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না। তেমনি দু'জন নারী একই কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৯৯ ৬ষ্ঠ খণ্ড)*। অত্র হাদীছে নারী-পুরুষকে বিশেষভাবে পর্দা করার কথা বলা হয়েছে। তেমনি নারী-পুরুষ পরস্পরের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে একজন নারী যেন অন্য নারীর হাতের কব্জি ও মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য না করে।

অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল বলেছেন, 'একজন নারী অপর নারীর অঙ্গের সাথে অঙ্গ লাগাতে বা স্পর্শ করতে পারে না। কারণ সে তার স্বামীর নিকট ঐ নারীর অঙ্গের বর্ণনা দিবে তখন তার স্বামী ঐ মহিলাকে অন্তর দৃষ্টিতে দেখবে' *(মিশকাত হা/৩১০০)*। মুমিনা মহিলার জন্য নিজের স্বামীর কাছে অন্য কোন মহিলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা দেওয়া সমীচীন নয়। বিশেষ করে মহিলারা মাথার উকুন মারার নাম করে একে অপরের মাথা দেখাদেখি করে। কিন্তু স্বামীর নিকট অন্য মহিলার চুলের বর্ণনা দেয়া ঠিক নয়।

জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই হবে নারী। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে স্বামীর অবাধ্য হওয়া এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা। স্বামীর অসন্তুষ্টিতে স্ত্রীর ইবাদত কবুল হয় না। তাই স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল ইবাদত করতে পারে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى اِمْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنَى عَنْهُ–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ঐ মহিলার দিকে করুনার দৃষ্টিতে তাকাবেন না, যে স্বামীর শুকরিয়া আদায় করে না। আর সে স্বামীকে নিজের জন্য পরিপূর্ণ মনে করে না' *(ত্বাবারানী, কাবায়ির, পৃঃ ২৯৩)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ العَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُوْثُ وَرِجْلَةُ النِّسَاءِ–

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না। (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। (২) বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ দানকারী পুরুষ (৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলা *(নাসাঈ)*।

বর্ণিত আছে যে কোন এক সময় সূর্য গ্রহণের ছালাতের পর ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনাকে দেখলাম আপনি এই স্থান হ’তে কিছু সামনে গেলেন। অতঃপর আবার পিছনে আসলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি জান্নাত দেখলাম। আমি সেখান হ’তে একটি ফলের গোছা নেওয়ার ইচ্ছা করছিলাম। আমি যদি একটি গোছা নিতাম তাহ’লে তোমরা পৃথিবী বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত খেতে পারতে। তারপর জাহান্নাম দেখলাম, আজকের মত আশ্চর্য দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। সেখানে দেখলাম অধিকাংশই নারী। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এর কারণ কি? তিনি বললেন, তাদের কুফুরীর কারণে। বলা হল, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফুরী করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না তারা স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না এবং অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করে না। তুমি যদি সারা জীবন তাদের সাথে অনুগ্রহ কর অতঃপর তোমার মধ্যে কোন কিছু লক্ষ্য করে, তারা বলে আমি তোমার নিকট কখনো কল্যাণ পাইনি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩১৭, ৩য় খণ্ড)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে নারী। কারণ তারা স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না এবং তার অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করে না ।

عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ مَا آلُوهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ

হুছাইন ইবনু মিহছান বলেন, আমার ফুফু আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যে, কোন প্রয়োজনে আমি রাসূল ﷺ এর কাছে আসলাম। অতঃপর নবী ﷺ বললেন, ‘হে ওমুক মহিলা! তোমার স্বামী আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি তার জন্য কেমন? সে বলল, আমি তার আনুগত্য ও খিদমতে কমতি করি না। তবে আমি তার পক্ষ থেকে কমতি পাই। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি অপেক্ষা কর, তুমি তার মাধ্যমে কোথায় যাবে? কেননা সে তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম’ *(আহমাদ, মুছন্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২৮৫ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহা হা/২৬১২, ১৯৩৪)*।

উপরোল্লিখিত হাদীছ ও আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারী-পুরুষ সবাইকে কৃত পাপের জন্য জাহান্নামে যেতে হবে। কিন্তু মহিলাদের ঐ সমস্ত পাপ ছাড়াও বেপর্দা হয়ে চলা এবং স্বামীর অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে অধিক পরিমাণে জাহান্নামে যেতে হবে। অতএব প্রত্যেক নারী-পুরুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত থেকে সৎ আমল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে নারীদেরকে সৎ আমলের পাশাপাশি যথাযথ পর্দা মেনে চলতে হবে এবং স্বামীর বাধ্য ও অনুগত হ’তে হবে।

নারী-পুরুষ সবাইকে সৎআমলের পাশাপাশি আল্লাহর সৃষ্টি জীবের প্রতি সদাচরণ করতে হবে। কেননা হাদীছে আছে এক মহিলা একটি বিড়ালের প্রতি নিষ্ঠুর ও নির্দয় আচরণ করার কারণে জাহান্নামে যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِيْ هِرَّةٍ اَمْسَكَهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنَ الْجُوْعِ فَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَلاَ تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ-

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর ও আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। সে বিড়ালটিকে আটকিয়ে রেখেছিল, ফলে সেটি ক্ষুধায় কাতর হয়ে মারা যায়। সে বিড়ালটিকে খাদ্যও দিত না এবং ছেড়েও দিত না। যাতে সে যমীনের কীট-পতঙ্গ ধরে খেতে না পারায় সেটি মারা গেল’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯০৩, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮০৮, ৪র্থ খণ্ড)*।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের সূরা তাহরীমের শেষভাগে বিশ্বের সকল মহিলাদের জন্য চারজন নারীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তন্মধ্যে দু'জনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুমিনদের জন্য। এ দু'জন হচ্ছেন, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া (রাঃ) তিনি আল্লাহদ্রোহী প্রতাপশালী সম্রাটের স্ত্রী হয়েও কঠিন বিপদের মধ্যে থেকে অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেও ঈমানের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন। তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হননি। ফলে আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেই জান্নাতে তার স্থান দেখিয়েছেন। অন্য হচ্ছেন, ঈসা (আঃ)-এর মাতা মরিয়াম বিনতু ইমরান। তিনি তাঁর সতীত্বকে বজায় রেখেছিলেন এবং তিনি ছিলেন বিনয় প্রকাশকারিণীদের অন্যতম।

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ-

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, 'পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণ ঈমানদার হয়েছেন কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ব্যতীত আর কেউ পূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারেনি' *(তাফসীর কুরআনুল কারীম, সূরা তাহরীম; বুখারী হা/৩৪১১; মুসলিম হা/৪৪৫৯; মিশকাত হা/৫৭২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ ৫৪৭৯)*।

আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য নূহ (আঃ)-এর পত্নী ও লূত (আঃ)-এর পত্নীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তারা ছিল ধর্মপরায়ন আমার দুই বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হ'ল, জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর' *(তাহরীম ১০)*। উল্লিখিত আয়াতে যে দু'জন নবীর স্ত্রী দ্বীনের ব্যাপারে নিজ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং গোপনে কাফের-মুশরিকদের সাহায্য করেছিল। ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহর প্রিয় পয়গম্বরদের স্ত্রী হওয়ার পরও তারা জ্হান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারেনি। তাদের একজন হচেছ নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী 'ওয়াগেলা' ও অপরজন লূত (আঃ)-এর স্ত্রী 'রয়াহেলা' *(তাফসীর কুরআনুল কারীম, সূরা তাহরীম)*।

এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুমিনের ঈমান তার কোন কাফের আত্মীয়-স্বজনের কোন উপকারে আসবে না। যেমন নবীগণ তাদের কাফের স্ত্রীদের জন্য কোন উপকার করতে পারেননি। তাই সকলকে সাবধান হ'তে হবে, পাপ কাজ হ'তে বিরত থেকে বেশী বেশী সৎ আমল করতে হবে। প্রত্যেক নারী-পুরুষকে নিজ নিজ আমলের কারণে জান্নাতে বা জাহান্নামে যেতে হবে। এক্ষেত্রে কারো পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী বা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজনদের বদৌলতে আল্লাহর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে না। আবার এটাও ঠিক যে, কোন পাপাচার কাফেরের মুমিনা স্ত্রী তার স্বামীর কারণে শাস্তি ভোগ করবে না। বরং প্রত্যেককেই নিজ নিজ কৃতকর্মের হিসাব আল্লাহর নিকট দিতে হবে। আর স্ব স্ব আমলের কারণেই শান্তি বা শাস্তি ভোগ করবে। এক্ষেত্রে কারো পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না বা কারো পাপের কারণে অন্যকে শাস্তি দেওয়া হবে না।

জান্নাতী নারী

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا–

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎ আমল করে তারাই হচ্ছে সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে' *(আল-বাইয়েনাহ ৭-৮)*। মানুষের পার্থিব কৃতকর্মের কারণে পরকালে তারা জান্নাত বা জাহান্নামের অধিবাসী হবে। উপরোক্ত আয়াতে মুমিন নর-নারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

عَنْ ابن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ النبي فِي الْجَنَّةِ والصديقُ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ والرَّجُلُ يَزُوْرُ أَخَاهُ فِيْ نَاحِيَةِ المِصْرِ لاَ يَزُوْرُهُ إلاَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنِسائُكُمْ مِن أهلِ الجَنَّةِ الوَدُودُ الْمَولُودُ العَؤُودُ عَلَى زَوْجَهَا الَّتِيْ إِذَا غَضَبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجَهَا وَتَقُوْلُ لاَ اذوْقُ غَمَضًا حتَّى تَرْضَى–

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসী পুরুষদের সংবাদ দিব না? নবী জান্নাতী, সত্যবাদী জান্নাতী, শহীদ জান্নাতী, নবজাতক শিশু জান্নাতী, একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীনি ভাইয়ের সাক্ষাৎকারী জান্নাতী। আর ঐসব স্ত্রীগণ হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী যারা বন্ধুভাবাপন্ন, স্নেহপরায়ণ, বেশি বেশি সন্তান প্রসবকারিণী, স্বামীর প্রতি বারংবার গভীর প্রেম বিনিময়কারিণী। কোন সময় স্বামী রাগান্বিত হ'লে, স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জন না করা পর্যন্ত কোন খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করবো না' *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৮৭)*।

অত্র হাদীছে চারটি গুণবিশিষ্ট মহিলাকে জান্নাতী বলা হয়েছে। (১) স্বামীকে খুব বেশি ভালবাসা, (২) ঘন ঘন সন্তান প্রসব করা (৩) স্বামীর সাথে বারংবার গভীর প্রেম বিনিময়ে অনুরাগী হওয়া (৪) স্বামী কোন কারণবশত রাগান্বিত হ'লে স্বামীকে রাযী-খুশী না করা পর্যন্ত খাদ্য না খাওয়ার দৃঢ় পরিকল্পনা করা।

অন্য বর্ণনায় আছে, স্বামীর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিই হচ্ছে মহিলাদের জান্নাত ও জাহান্নাম *(সিলসিলা ছহীহা হা/২৬১২, ১৯৩৪)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'স্ত্রীলোক যখন তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে ও স্বামীর অনুগত থাকে, তখন সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে' *(আবু নু'আইম, মিশকাত হা/৩২৫৪, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১১৫, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছের ভাব ও ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, মহিলাদের জন্য জান্নাত লাভ একেবারেই সহজ। কেননা চারটি গুণসম্পন্ন মহিলার জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দরজা দিয়ে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। মুসলিম মহিলাদের জন্য উপরোক্ত চারটি গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করা অতিব যরূরী।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا–

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'স্ত্রী ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র হক্ব আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার স্বামীর হক্ব আদায় না করবে। যদি স্বামী উটের গদির উপর থাকা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবুও স্ত্রীকে সম্মতি প্রকাশ করতে হবে' *(ইবনু মাজাহ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২৮৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর সন্তুষ্টিই হচ্ছে স্ত্রীর জন্য আল্লাহর হক্ব আদায় করা। সুতরাং যে মহিলা স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারল সে আল্লাহর হক্ব আদায় করতে পারল। আর আল্লাহর হক্ব আদায় করার অর্থই হচ্ছে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। তাই প্রত্যেক মুমিনা আদর্শ নারীকে নিজের স্বামীর ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। কেননা স্বামীই হচ্ছে তার জান্নাত ও জাহান্নাম।

আল্লাহর সৃষ্টি জীবের প্রতি সদয় আচরণ করতে হবে। কেননা রাসূল বলেছেন, সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবারভুক্ত। সুতরাং যমীনে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া কর। আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। হাদীছে আছে একটি কুকুরের প্রতি অনুগ্রহ করার কারণে একজন ব্যভিচারিণী মহিলা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পেরেছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একজন পতিতা মহিলাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। একটি কূপের পাশে উপবিষ্ট একটি কুকুরের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে সে দেখল কুকুরটি হাপাচ্ছে এবং পিপাসায় মারা যাওয়ার উপক্রম। কুকুরটির এ অবস্থা দেখে সে নিজের মোযা খুলে মাথার ওড়নার সাথে বেঁধে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে কুকুরটিকে পান করাল। এর ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হ'ল। এসময় রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল পশুর সেবায়ও কি কল্যাণ আছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর সেবায় কল্যাণ আছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮০৭)*।

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, একটি প্রাণীর প্রতি দয়া করার কারণে একজন বারবণিতার মত পাপী মহিলাকে যদি আল্লাহ ক্ষমা করে দেন, তাহ'লে

আমাদেরকেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর হুকুম পালনের সাথে সাথে তাঁর সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করতে হবে।

আওফ ইবনু মালেক আল-আশজাঈ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ও কালো গণ্ডদ্বয় বিশিষ্ট মহিলা ক্বিয়ামতের দিন এভাবে নিকটবর্তী হব। রাবী ইয়াযীদ ইবনু যুরাঈ নিজের মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলীর প্রতি ইঙ্গিত করে দেখালেন। অর্থাৎ সে এমন মহিলা যার স্বামী নেই অথচ সে মর্যাদাশীলা ও রূপসী হওয়া সত্ত্বেও ইয়াতীম সন্তানদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে যে পর্যন্ত তারা (স্বনির্ভর হয়ে মায়ের সেবা-যত্ন হ'তে) পৃথক হয়ে যায় বা মৃত্যুবরণ করে' *(আবুদাউদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৬১)*।

রাসূল (ছাঃ) পুরুষদের মধ্যে যেমন অনেককে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তেমনি নারীদের মধ্যেও কয়েকজনের সম্পর্কে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তারা হচ্ছেন ফের'আউনের স্ত্রী আসিয়া, ইমরানের কন্যা মারিয়াম, খুওয়াইলিদের কন্যা খাদীজা, মুহাম্মাদ (ছাঃ)এর মেয়ে ফাতিমা এবং আবুবকর (রাঃ)-এর মেয়ে আয়েশা। ফের'আউনের স্ত্রী আসিয়া আল্লাহর কাছে যালিম সম্প্রদায়ের নিকট থেকে মুক্তি ও জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণের প্রার্থনা করেছিল। আল্লাহর বাণী,

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

'আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার লোকদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করেছেন। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া দো'আ করে বললেন, হে আল্লাহ্! আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে মুক্তি দাও। মুক্তি দাও আমাকে অত্যাচারী লোকদের নির্যাতন থেকে' *(তাহরীম ১১)*। আল্লাহ তার দো'আ কবুল করেছিলেন।

মারিয়াম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾

‘আর ইমরান কন্যা মারিয়ম, যিনি তাঁর যৌনাঙ্গের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তখন আমি তার মধ্যে আমার থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছি। তিনি তার প্রতিপালকের সব কথা ও তাঁর কেতাব সমূহের সত্যতা মেনে নিয়েছেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন নিয়মিত ইবাদতকারিণী, আল্লাহ্‌র আদেশ পালনকারী বিনয়ী লোকদের অন্তর্ভুক্ত’ *(তাহরীম ১২)*।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ-

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ‘সারা বিশ্বের মহিলাদের মধ্য থেকে এই চারজন মহিলার ফযীলত সম্পর্কে তোমার অবগত হওয়া যথেষ্ট। তাঁরা হচ্ছেন ইমরানের মেয়ে মারিয়াম, খুওয়াইলেদের মেয়ে খাদীজা, মুহাম্মদ ﷺ এর মেয়ে ফাতিমা এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া’ *(তিরমিযী হা/৩৮৭৮, মিশকাত হা/৬১৮, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯৩০)*।

আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন,

وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ-

‘সব নারীর উপর আয়েশার মর্যাদা এমন যেমন সব রকমের খাদ্য সামগ্রীর উপর ছারীদের মর্যাদা’ *(বুখারী হা/৩৪১১, মুসলিম হা/৪৪৫৯, মিশকাত হা/৫৭২৪, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৭৯)*। রুটি টুকরা টুকরা করে গোশতের ঝোলের মধ্যে ভিজিয়ে দেওয়াকে ছারীদ বলে। এটা আরবের একটি জনপ্রিয় খাদ্য।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা জিবরীল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ যে খাদীজা একটি পাত্র নিয়ে আসছেন। তার মধ্যে তরকারী ও খাদ্যদ্রব্য আছে। তিনি যখন আপনার নিকট আসবেন তখন তাকে তার রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন। আর তাকে জান্নাতের মধ্যস্থিত মুক্তখচিত এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ প্রদান করবেন, যেখানে কোন হৈ হুল্লোড় বা কোন কষ্ট নেই’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৭৬, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯২৫)*।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَامَ الْفَتْحِ فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَنْ بُكَائِهَا وَ ضِحْكِهَا فَقَالَتْ أَخْبَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُوْتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِيْ أَنِّيْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اِلاَّ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ–

উম্মু সালমা (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর এক দিন রাসূল (ছাঃ) ফাতিমাকে ডাকলেন এবং চুপে চুপে কিছু কথা বললেন। কথা শুনে ফাতিমা কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তিনি পুনরায় তার সাথে কথা বললেন। এবার ফাতিমা হাসলেন। উম্মু সালমা বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ওফাতের পর আমি ফাতিমা (রাঃ)-কে ঐ দিনের কাঁদার ও পরক্ষণেই হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেছেন যে, অচিরেই তিনি ইন্তিকাল করবেন। একথা শুনে আমি কেঁদেছি। তারপর তিনি আমাকে বললেন, আমি মারিয়াম বিনতু ইমরান ব্যতীত জান্নাতী সমস্ত নারীদের সরদার হব। একথা শুনে আমি হেসেছি' *(তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ ৫৯৩৩)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ رَضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى القَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ المَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ وَ صَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَ الَّذِي يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدَمِ شَهِيْدٌ وَ الْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجَمْعٍ شَهِيْدٌ.

জাবের ইবনু আতিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে নিহত হয়ে শহীদ হওয়া ব্যতীত সাত শ্রেণীর শহীদ রয়েছে। (১) মহামারীতে মৃতব্যক্তি শহীদ (২) পানিতে ডুবে মৃতব্যক্তি শহীদ (৩) 'যাতুল জানব' বা প্লেগ রোগে (এমন রোগ যাতে পাজরের নীচে হৃদয়ের নিকটে দানা উঠে এবং রোগীর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, এরূপ রোগে) মৃতব্যক্তি শহীদ। (৪) পেটের রোগে মৃতব্যক্তি শহীদ (৫) আগুনে পুড়ে মৃতব্যক্তি শহীদ (৬) কোন কিছু চাপা পড়ে মৃতব্যক্তি শহীদ এবং (৭) প্রসবকষ্টে মৃত স্ত্রীলোক শহীদ' *(মুয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৫৬১, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৭৫, ৪র্থ খণ্ড)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে নিহত শহীদগণ ছাড়াও সাত শ্রেণীর লোককে শহীদের মর্যাদা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তন্মধ্যে সন্তান প্রসবের সময় যেসব মহিলা মৃত্যুবরণ করে তারাও শহীদের মর্যাদা পাবে।

উপরোক্ত হাদীছগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) নারীদেকে যেমন জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন তেমনি জান্নাতের সুসংবাদও দিয়েছেন। ইবাদত-বন্দেগী, পরহেযগারিতা ও সৎ আমল ছাড়াও দুই শ্রেণীর নারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। (১) যে বিধবা নারী তার ইয়াতীম সন্তান প্রতিপালনের জন্য নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে বিবাহ না করে একাকী জীবন যাপন করে, যতদিন না তারা স্বনির্ভর হয়। (২) সন্তান প্রসবকালে মৃত্যুবরণকারিণী নারী। এটা দ্বারা কঠিন বিপদের সময়েও ধৈর্য ধারণ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

জান্নাতী মহিলাদের অবস্থাঃ

জান্নাতে নারীগণ হবেন পূর্ণ যুবতী। আল্লাহ বলেন, وَ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا– ‘সমবয়স্কা পূর্ণযৌবনা তরুণীগণ’ *(নাবা ৩৩)*।

জান্নাতবাসিনী নারীদের সৌন্দর্য সম্পর্কে বলেন, যদি জান্নাতবাসিনী কোন নারী (হূর) পৃথিবীর পানে উঁকি দেয় তবে সমগ্র জগৎ তার রূপের ছটায় আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান সমূহ সুগন্ধিতে মোহিত করে ফেলবে। এমনকি তাদের (হূরদের) মাথার ওড়না গোটা দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সম্পদরাজি হ’তেও উত্তম *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৩)*।

অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) জান্নাতবাসিনী নারীদের সৌন্দর্যের বর্ণনা এভাবে দেন, সৌন্দর্যের দরুন তাদের হাড় ও গোশতের উপর দিয়ে নলার ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকবে। তারা কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। তাদের পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে না, থুথু ফেলবে না, সর্দি-কাশি হবে না। তাদের পাত্র সমূহ হবে সোনা-রূপার তৈরী। তাদের চিরুণী স্বর্ণের এবং ধুনীর জ্বালানী হবে আগরের। তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর মত (সুগন্ধিযুক্ত)। তাদের স্বভাব হবে মানুষের মত, শারীরিক গঠন বা

অবয়ব হবে পিতা আদম (আঃ)-এর ন্যায় এবং উচ্চতায় ষাট গজ লম্বা *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ১০ম খণ্ড, হা/৫৩৭৮)*।

জান্নাতে হূরগণ হবেন এমন অপরূপা ও লাবণ্যময়ী যা মানুষ কোনদিন দেখেনি এবং কল্পনাও করেনি।

عن أبي هريرة رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوَّلُ زَمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِيْنَ عَلَى أَثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِيْ السَّمَاءِ أَضَاءَ قُلُوْبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ تَبْغَضُ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسَدُ لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يَرَى مُخَّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। আর তাদের পরে যারা প্রবেশ করবে তাদের চেহারা আকাশের উজ্জ্বল তারকার চেয়েও অধিক সুন্দর ও উজ্জ্বল হবে। তাদের অন্তরগুলি হবে এক ব্যক্তির অন্তরের মত। তাদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ থাকবে না, কোন হিংসা থাকবে না। আর তাদের প্রত্যেকের ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট দু'জন করে স্ত্রী থাকবে, যাদের পদতলের অস্থিমজ্জা হাড় ও গোস্ত ভেদ করে দেখা যাবে' *(বঙ্গানুবাদ বুখারী, ৩য় খণ্ড, হা/৩২৫৪)*।

অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের হূরগণের চেহারার উজ্জ্বলতা আয়না অপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ হবে' *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৯)*।

হূরদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ

'সেখানে থাকবে টানাটানা, ডাগর ডাগর আখি বিশিষ্ট নারীগণ। আর তারা হবে আবরণে রক্ষিত মতির ন্যায়' *(ওয়াক্বি'আহ ২২, ২৩)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'জান্নাতবাসীদের নিকট থাকবে আয়ত লোচনা তরুণীগণ। অর্থাৎ তারা তাদের স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের দিকে তাকাবে না। আল্লামা ইবনু জাওযী বলেন, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টিকে নত রাখবে। অর্থাৎ তারা এমন অনিন্দ্য সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা হবে যে, তাদেরকে

পেয়ে স্বামীদের অন্তরে অন্য কোন নারীর প্রতি বাসনাই হবে না *(কুরআনুল কারীম)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'যেন তারা সুরক্ষিত ডিম'।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতী হূরদের সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। তাদের সৌন্দর্য বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। তার হচ্ছেন অতিব সুন্দরী। রাসূল (ছাঃ) জাহান্নামে মহিলাদের সংখ্যা যেমন বেশী হবে উল্লেখ করেছেন, তেমনি জান্নাতেও তাদের সংখ্যা অধিক হবে বলে উল্লেখ করেছেন।

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَدْنَى أَهْلُ الْجَنَّةِ الَّذِيْ لَهُ ثَمَانُوْنَ اَلْفَ خَادِمٌ وَاثْنَتَانِ وَ سَبْعُوْنَ زَوْجَةٌ–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিম্নমানের জান্নাতবাসীর জন্য আশি হাযার খাদেম এবং বাহাত্তর জন স্ত্রী হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৬)*।

একজন নিম্নমানের জান্নাতবাসীর স্ত্রী যদি বাহাত্তর জন হয় তাহ'লে কত লোক জান্নাতে যাবে আর তাদের স্ত্রীর সংখ্যা কত হবে? অতএব জান্নাতেও নারীদের সংখ্যা বেশী হবে। জান্নাতে নারীগণ সর্বদা তাদের স্বামীদের উপর রাযী-খুশি থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عن علي رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ يَرْفَعْنَ بِاَصْوَاتٍ لَمْ تَسْمَعُ الْخَلاَئِقُ مِثْلَهَا يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ نَبِيْدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبَاسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَسْخَطُ طُوْبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ.

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের হূরগণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে উচ্চ আওয়াজে সুমধুর সুরে সুললিত কণ্ঠে গান গাইবে। সৃষ্টিজীব কখনো সেই সুর শুনতে পায়নি। তারা বলবে স্বামী গো! আমরা চিরদিন থাকব কখনো ধ্বংস হব না। স্বামী গো! আমরা সর্বদা সুখে আনন্দ-ফুর্তিতে থাকব কখনো দুঃখ-দুশ্চিন্তায় পতিত হব না। স্বামী গো! আমরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকব

কখনো নাখোশ হব না। সুতরাং ধন্যবাদ, যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যিনি' *(তিরমিযী, বিঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৭)*।

যিকিরের আলোচনা

ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, দান-ছাদাক্বার মত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে যিকর। যিকর অর্থ স্মরণ করা। অর্থাৎ বিভিন্ন তাসবীহও দো'আ পাঠের মাধ্যমে সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করার নামই হচ্ছে যিকর। মুমিন নারী-পুরুষকে সর্বদা যিকর করার অভ্যাস করা যরূরী। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'শ্রেষ্ঠ যিকর হ'ল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল 'আলহামদুলিল্লাহ' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হ/২৩০২)*।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' বলবে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হ/২৩০৪ হাদীছ ছহীহ)*।

عن أبي هريرة رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاَنْ أَقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার নিকট সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষাও প্রিয়তর হচ্ছে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৫; বাংলা মিশকাত হা/২১৮৭)*।

عن أبي هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حَطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার ন্যায় অধিক হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৬; বাংলা মিশকাত হা/২১৮৮)*।

عن أبي هريرة رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَـانِ عَلَـى اللِّـسَانِ ثَقِيْلَتَـانِ فِـي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'টি সংক্ষিপ্ত বাক্য যা বলা সহজ, অথচ পাল্লাতে ভারী ও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। তা হল, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৮; বাংলা মিশকাত হা/২১৯০)*।

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে লাগল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি রহম কর এবং নীরবে তাকবীর পাঠ কর। তোমরা বধিরকে ডাকছ না এবং অনুপস্থিতকেও ডাকছ না। তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টাকে, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। যাকে তোমরা ডাকছ তিনি তোমদের বাহনের ঘাড় অপেক্ষাও তোমাদের অধিক নিকটে আছেন। আবু মূসা বলেন, আমি তখন রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম, لاَ حَـوْلَ وَلاَقُوَّةَ إلاَّ بِالله (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) অর্থাৎ আমার কোন উপায় নেই, কোন শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওহে ইবনু কায়েস! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভান্ডার সমূহের একটি ভান্ডারের সন্ধান দিব না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তা হচ্ছে- لاَ حَـوْلَ وَلاَقُـوَّةَ إلاَّ بِـالله 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৩; বাংলা মিশকাত হা/২১৯৫)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশত বার বলবে سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْـدِهِ *(সুব্হ:নাল্ল-হিল 'আয:ীম ওয়া বিহ:াম্দিহ)* অর্থ 'আমি উচ্চ মর্যাদাশীল আল্লাহ্র প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করি', ক্বিয়ামতের দিন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না, কেবল সে ব্যক্তি ব্যতীত যে এর অনুরূপ বা এটা অপেক্ষা অধিকবার বলবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৭)*।

عن سمرة بن جندب قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفضَلُ الْكَلاَمِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَاتْ.

সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, শ্রেষ্ঠ বাক্য হচ্ছে চারটি- সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। অন্য বর্ণনায় আছে আল্লাহর প্রিয় বাক্য চারটি ‘সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র), আল-হামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান)। এর যে কোন একটি আগে পিছে হ’লে কোন ক্ষতি নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৪)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٍ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনিই হচ্ছেন, সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। ঐ ব্যক্তির দশটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী হবে। তার জন্য আরো একশত নেকী লেখা হবে এবং একশত গুনাহ মাফ করা হবে এবং এ বাক্য তাকে ঐ দিনের জন্য শয়তান হ’তে রক্ষাকবচ হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সে যা করছে তা অপেক্ষা উত্তম কেউ কিছু করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে এ আমল অপেক্ষা অধিক আমল করবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০২; বাংলা মিশকাত হা/২১৯৪)*।

এক নযরে তাসবীহগুলি নিম্নরূপ–

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ *(সুব্‌হ:া-নাল্লা-হি ওয়ালহ:াম্‌দুলিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আক্‌বার) (তিরমিযী, হাদীছ হাসান, মিশকাত, হা/২৩১৫)।*

لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ *(লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু)* আর সবচেয়ে উত্তম দো‘আ হচ্ছে- اَلْحَمْدُ لِلّهِ *(আল-হ:াম্‌দু লিল্লা-হ) (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ , মিশকাত, হা/২৩০৬)*।

لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٍ.

(লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্:দাহূ লা- শারীকা লাহ, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হ:ামদু ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর) সে ১০ জন দাস মুক্ত করার সমান নেকী পাবে।

سُبْحَانَ اللّه وَ بِحِمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمْ

(সুব্হ:া-নাল্লা-হি ওয়া বিহ:াম্দিহী সুব্হ:া-নাল্ল-হিল 'আয:ীম) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/২২৯৮)।

কালেমায়ে তাইয়েবাহ- لاَ اِلهَ إلاَّ اللّهُ *(লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ)*।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

কালেমায়ে শাহাদত

أَشْهَدُ أنْ لاَ اِلهَ إلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ.

উচ্চারণঃ *আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্:দাহূ লা- শারীকালাহূ ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহ:াম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রসূলুহ।*

অর্থঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মাদ (ছঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

عن أبي هريرة رضـ قال قال رسول اللّه ﷺ أنَّ لِلهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ إسْمًا مِائَةٌ إلاَّ وَاحِدٌ مَنْ أحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিরনব্বইটা এক কম একশত নাম রয়েছে। যে তা স্মরণ করবে সে জান্নাতে যবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বেজোড়, বেজোড়কে ভালবাসেন' *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/২২৮৭, 'দো'আ' অধ্যায়, 'আল্লাহ্ন নাম' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহর গুনবাচক নামের মাধ্যমে তাকে ডাকলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আল্লাহ্র গুণবাচক নাম সমূহ

(১) الله (আল্লাহ) আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। (২) الرَّحْمَانُ (আর্-রহ:মান) দয়াময়, (৩) الـرَّحِيْمُ (আর-রাহীম) দয়াবান, বিশেষ দয়ার অধিকারী (৪) المَلِكُ (আল-মালিক) রাজাধিরাজ (৫) القُدُّوْسُ (আল-কুদ্দুস) অতিপবিত্র (৬) السَّلَامُ (আস-সালাম) শান্তিময়, (৭) المُؤْمِنُ (আল-মুমিন) নিরাপত্তা দাতা, (৮) المُهَيْمِنُ (আল-মুহাইমিন) রক্ষক, (৯) العَزِيْزُ (আল-আযীয) প্রভাবশালীর, (১০) الجَبَّارُ (আল-জাব্বার) শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সংশোধনকারী, (১১) المُتَكَبِّرُ (আল-মুতাকাব্বির) অহংকারের অধিকারী, (১২) الخَالِقُ (আল-খালিক) স্রষ্টা (১৩) البَرِيُ (আল-বারী) ত্রুটিহীন স্রষ্টা (১৪) المُصَوِّرُ (আল-মুছাব্বির) অংকনকারী (১৫) الغَفَّارُ (আল-গাফফার) বড় ক্ষমাশীল (১৬) القَهَّارُ (আল-কাহহার) নির্বিঘ্নে ক্ষমতা প্রয়োগকারী, (১৭) الوَهَّابُ (আল-ওয়াহহাব) বড় দাতা , (১৮) الـرَّزَّاقُ (আর-রাযযাক) রিযিক দাতা (১৯) الفَتَّاحُ (আল-ফাত্তাহ) বিপদমুক্তকারী (২০) العَلِيْمُ (আল-আলীম) বড় জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ (২১) القَابِضُ (আল-কাবিয) সংকোচনকারী (২২) البَاسِطُ (আল-বাসিত) সম্প্রসারণকারী (২৩) الخَافِضُ (আল-খাফিয) নিচুকারী (২৪) الرَّافِعُ (আর-রাফি') যিনি উপরে উঠান (২৫) المُعِزُّ (আল-মুইযযু) সম্মানদাতা (২৬) المُذِلُّ (আল-মুযিল্লু) অপমানকারী (২৭) السَمِيْعُ (আস-সামী) সর্বশ্রোতা (২৮) البَصِيْرُ (আল-বাছীর) দর্শক (২৯) الحَاكِمُ (আল-হাকিম) নির্দেশ দানকারী (৩০) العَدْلُ (আল-আদল) ন্যায়বিচারক (৩১) اللَطِيْفُ (আল-লাতীফ) সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণকারী, অনুগ্রহকারী (৩২) الخَبِيْرُ (আল-খাবীর) ভিতরের বিষয় অবগত (৩৩) الحَلِيْمُ (আল-হালীম) ধৈর্যশীল (৩৪) العَظِيْمُ (আল-আযীম) বিরাট সম্মানীর (৩৫) الغَفُوْرُ (আল-গাফুর) বড় ক্ষমাকারী (৩৬) الشَّكُوْرُ (আশ-শাকূর) কৃতজ্ঞ, যিনি অল্পে বেশি পুরস্কার দান করেন (৩৭) العَلِيُّ (আল-আলী) সর্বোচ্চ সমাসীন (৩৮) الكَبِيْرُ (আল-কাবীর) সবচেয়ে মহান (৩৯) الحَفِيْظُ (আল-হাফীয) বড় রক্ষাকারী (৪০) المُقِيْتُ (আল-মুকীত) খাদ্যদাতা, দৈহিক ও আত্মিক শক্তিদাতা (৪১) الحَسِيْبُ (আল-হাসীব) অন্যের জন্য যথেষ্ট

(৪২) الجَلِيْـلُ (আল-জলীল) মহিমান্বিত (৪৩) الكَـرِيْمُ (আল-কারীম) বড় দাতা (৪৪) الرَّقِيْـبُ (আর-রাকীব) সর্বদা লক্ষকারী (৪৫) المُجِيْـبُ (আল-মুজীব) ডাকে সাড়া দাতা (৪৬) الوَاسِـعُ (আল-ওয়াসি') সম্প্রসারণকারী (৪৭) الحَكِـيْمُ (আল-হাকীম) নিখুঁতভাবে সকল কাজ সম্পাদনকারী (৪৮) الـوَدُوْدُ (আল-ওয়াদূদ) বান্দার কল্যাণকামী (৪৯) المَجِيْدُ (আল-মাজীদ) অসীম অনুগ্রহকারী (৫০) البَاعِثُ (আল-বায়েছ) প্রেরক (৫১) الـشَّهِيْدُ (আশ-শহীদ) কাজের সাক্ষী (৫২) الخَبِيْـرُ (আল-খাবীর) গোপন বিষয় অবগত (৫৩) الحَـقُّ (আল-হাক্ক) সত্য প্রকাশক (৫৪) القَـوِيُّ (আল-কাবী) শক্তিশালী (৫৫) المَتِـيْنُ (আল-মতীন) বড় ক্ষমতাবান (৫৬) الوَكِيْـلُ (আল-ওয়াকীল) অভিভাবক (৫৭) الحَمِيْـدُ (আল-হামীদ) প্রশংসিত (৫৮) المُحْـص (আল-মূহছী) পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রক্ষক (৫৯) المُبْـدِيُّ (আল-মুবদী) নমুনাহীন স্রষ্টা (৬০) المُعِيْدُ (আল-মুঈদ) মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টিকারী (৬১) المُحْيِي (আল-মুহয়ী) জীবনদাতা (৬২) المُمِيْـتُ (আল-মুমীত) মৃত্যুদানকারী (৬৩) الحَـيُّ (আল-হাই) চিরঞ্জীব (৬৪) القَيُّـوْمُ (আল-কাইয়ূম) স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত (৬৫) الوَاجِـدُ (আল-ওয়াজিদ) ইচ্ছামত পাই এমন স্রষ্টা (৬৬) المَجِيْـدُ (আল-মাজীদ) বড় দাতা (৬৭) الوَاحِـدُ (আল-ওয়াহেদ) একক (৬৮) الأَحَـدُ (আল-আহাদ) অংশীদার নেই যার (৬৯) الـصَّمَدُ (আছ-ছামাদ) অমুক্ষাপেক্ষি (৭০) القَـادِرُ (আল-কাদের) ক্ষমতাবান (৭১) المُقْتَـدِرُ (আল-মুক্তাদির) সকলের উপর ক্ষমতাবান (৭২) المُقَـدِّمُ (আল-মুকাদ্দিম) যিনি আগে বাড়ান ও নিকটে করেন (৭৩) المُـؤَخِّرُ (আল-মুআখখির) যিনি ইচ্ছামত পিছনে রাখেন (৭৪) الأَوَّلُ (আল-আউয়াল) অনাদী (৭৫) الآخِـرُ (আল-আখির) অনন্ত (৭৬) الظَّـاهِرُ (আয-যাহির) প্রকাশকারী (৭৭) البَـاطِنُ (আল-বাতিন) গোপনকারী (৭৮) الـوَالِي (আল-ওয়ালী) অভিভাবক (৭৯) المُتَعَـالِي (আল-মুতাআলী) সর্বোপরি (৮০) البَـرُّ (আল-বাররু) অনুগ্রহকারী (৮১) التَّـوَّابُ (আত-তাওয়াব) তাওবা গ্রহণকারী (৮২) المُنْتَقِـيْمُ (আল-মুনতাকীম) প্রতিশোধ গ্রহণকারী (৮৩) العَفُـوُّ (আল-আফুব্বু) বড় ক্ষমাশালী (৮৪) الـرَّءُوْفُ

(আর-রউফ) বড় দয়ালু (৮৫) مَالِكُ الْمُلْكِ (আল-মালিকিল মুলক) রাজ্যাধিপতি (৮৬) ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ (যুলজালালি ওয়াল ইকরাম) প্রতাপশালী মর্যাদাবান (৮৭) الْمُقْسِطُ (আল-মুকসিত্ব) অত্যাচার দমনকারী (৮৮) الْجَامِعُ (আল-জামে) সর্বগুণের অধিকারী অথবা ক্বিয়ামতের দিন একত্রকারী (৮৯) الْغَنِيُّ (আল-গনী) মুখাপেক্ষীহীন (৯০) الْمُغْنِي (আল-মুগনী) যিনি কাউকে কারো মুক্ষাপেক্ষী হ'তে রক্ষা করেন (৯১) الْمَانِعُ (আল-মুনি') বিপদে বাধাদানকারী (৯২) الضَّارُّ (আয-যার) যিনি ক্ষতির ক্ষমতা রাখেন (৯৩) النَّافِعُ (আন-নাফে') যিনি উপকারের ক্ষমতা রাখেন (৯৪) النُّوْرُ (আন-নূর) আলো দানকারী (৯৫) الْهَادِيُّ (আল-হাদী) পথপ্রদর্শক (৯৬) الْبَدِيْعُ (আল-বাদী'উ) নমুনাবিহীন স্রষ্টা (৯৭) الْبَاقِي (আল-বাকী) যিনি সর্বদা থাকবেন (৯৮) الْوَارِثُ (আল-ওয়ারিছ) সকলের উত্তরাধিকারী (৯৯) الرَّشِيْدُ (আর-রশীদ) পথ নির্দেশক (১০০) الصَّبُوْرُ (আছ-ছবূর) বড় ধৈর্যশীল।

বিশেষ আশ্রয় প্রার্থনা

আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার জন্য এক বিশেষ প্রার্থনা। যা ছলাতের মধ্যে ও বিভিন্ন সময়ে বলা উচিত। নবী করীম (ছাঃ) সাধারণতঃ এসব দো'আর মাধ্যমে আল্লাহরনিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

অর্থঃ হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট জাহান্নামের শাস্তি হ'তে আশ্রয় চাই, কবরের শাস্তি হতে আশ্রয় চাই, দাজ্জালের ফিৎনা হতে আশ্রয় চাই, ইহকাল ও পরকালের ফিৎনা হতে আশ্রয় চাই *(মুসলিম মিশকাত পৃঃ ৮৭)*।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থঃ হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ভীরুতা হতে আশ্রয় চাই, কৃপণতা হতে আশ্রয় চাই, অতি বার্ধক্য হতে আশ্রয় চাই। আর আপনার নিকট আশ্রয় চাই দুনিয়াবী ফিৎনা ও কবরের শাস্তি হতে *(বুখারী. মিশকাত পৃঃ ৮৮)*।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشِّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই বিপদাপদের কষ্ট, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, মন্দ ফায়ছালা হতে এবং বিপদে শত্রুর হাসি হতে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২১৬)*।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ ضَلَعِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ–

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হামমি ওয়াল হু:ঝনি ওয়াল আজ্‌ঝি ওয়াল্ কাসলি ওয়াল জুব্‌নি ওয়াল বুখ্‌লি ওয়া যালা'ইদ দায়নি ওয়া গলাবাতির্ রিজা-ল।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি হ'তে' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৫৮*)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسْلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِيْ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

অর্থঃ হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা, অতি বার্ধক্য, কর্য গোনাহ হ'তে। হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নামের শাস্তি ও জাহান্নামের ফিৎনা, কবরের ফিৎনা, কবরের শাস্তি, অর্থ-বিত্তের ফিৎনার অনিষ্ট, দারিদ্রের ফিৎনার অনিষ্ট, দাজ্জালের ফিৎনার অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমার বরফ ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে আমার গোনাহ সমূহ ধুয়ে দাও, আমার অন্তর

পরিষ্কার করে দাও যেমনভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। তুমি আমার গোনাহ ও আমার মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি কর যেমনভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব করেছ। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২১৬)*।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ آتِ نَفسِيْ تَقْوهَا زَكِّيْهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, অতি বার্ধক্য ও কবরের শাস্তি হতে। হে আল্লাহ! আপনি আমার আত্মাকে পরহেযগারিতা দান করুন, আপনি তাকে পরিশুদ্ধ করুন, আপনি উত্তম পরিশুদ্ধতা দানকারী, আপনি আত্মার অভিভাবক ও তার সাহায্যকারী। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এমন বিদ্যা হতে যা উপকার করে না, এমন অন্তর হতে যা ভয় করে না, এমন আত্মা যা তৃপ্তি লাভ করে না এবং দো'আ হতে যা কবুল হয় না *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২১৬)*।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই আপনার অনুগ্রহ চলে যাওয়া হতে, আপনার নিরাপত্তা বিপদাপদে পরিবর্তন হওয়া হতে, আপনার আকস্মিক শাস্তি হতে এবং আপনার সর্বপ্রকার অসন্তুষ্টি হতে *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২১৬)*।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

***উচ্চারণঃ** আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শার্‌রি মা- 'আমিলতু ওয়া মিন শার্‌রি মা- লাম আ'মাল।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যা আমি করেছি তার অনিষ্ট হ'তে, আর যা আমি করিনি তার অপকারিতা হ'তে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬২)*।

اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِيْ أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম, আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম, আপনার প্রতি ভরসা করলাম, আপনার নিকটে প্রত্যাবর্তন করব, আপনার সহযোগিতায় শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করব। হে আল্লাহ! আমি আপনার মর্যাদার মাধ্যমে আশ্রয় চাই আমাকে পথভ্রষ্ট করা হ'তে আপনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আপনি চিরঞ্জিব যার মরণ নেই, জিন ও মানুষের মরণ আছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২১৭)*।

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَ مِنْ سَيْئِ الْاَسْقَامِ–

উচ্চারণঃ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল বারস্বি ওয়াল জুযা-মি ওয়াল জুনূনি ওয়া মিং সায়ইল আসক্ব-ম।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই শ্বেত রোগ, কুষ্ঠরোগ, পাগলামি ও খারাপ রোগ সমূহ হ'তে' (*নাসাঈ, মিশকাত, হা/২৪৭০*)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ.

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই ঝগড়া-বিবাদ, মুনাফেক্বী ও অসৎ চরিত্র হতে *(নাসাঈ, মিশকাত পৃঃ ২১৬)*।

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَال وَالْأَهْوَاءِ.

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই অপসন্দীয় চরিত্র, অপসন্দনীয় চরিত্র ও মন্দ প্রবৃত্তি হতে *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২১৬)*।

ঌ৩৫ৼ